নবী-রাসুল সিরিজ-৩
কাসাসুল কুরআন-৩
হযরত ইউসুফ আ.
হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম
মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.
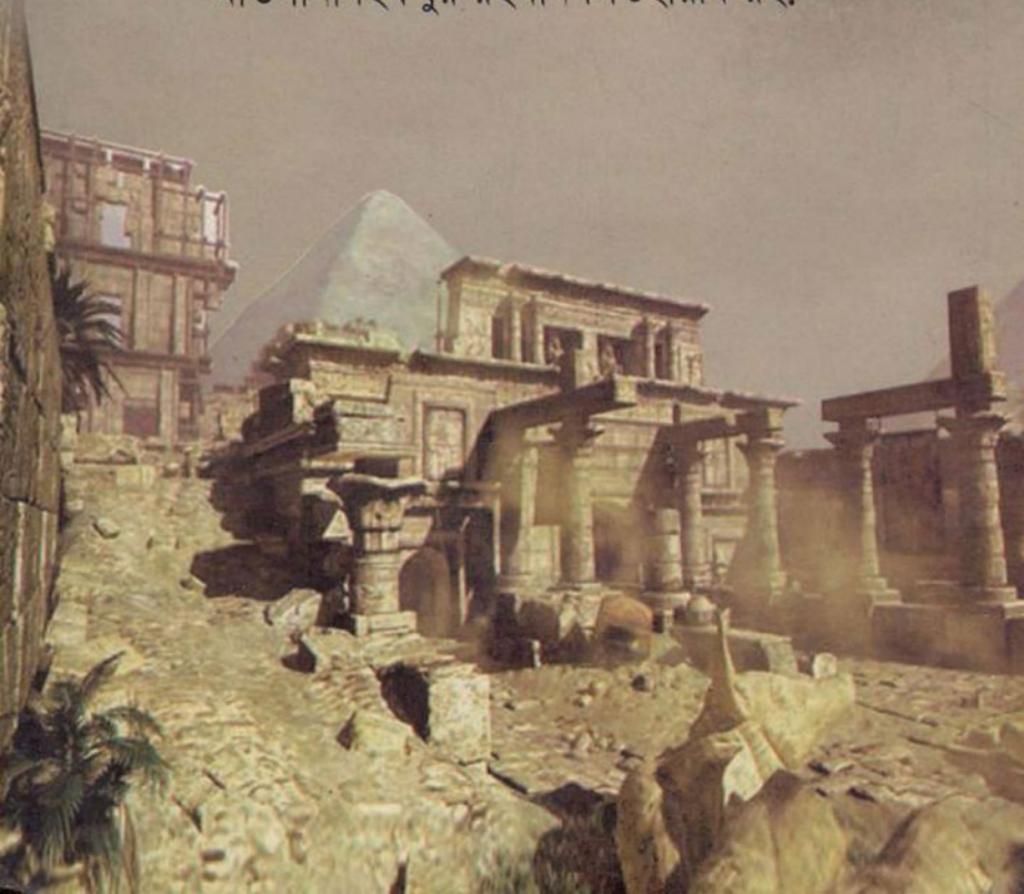
হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম

কাসাসুল কুরআন-৩

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম
হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম

মূল

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ

মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

www.almodina.com

কাসাসুল কুরআন-৩
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [3]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 100.00
ISBN : 978-984-90976-7-9
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

সূচি

কাসাসুল কুরআন-৩

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম
হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম

বংশপরিচয়

ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাম। হযরত ইবরাহিম আ.-এর প্রপৌত্র। তাঁর মায়ের নাম রাহিল বিনতে লাবান। হযরত ইয়াকুব আ. তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন; বরং তিনি তাঁকে অপরিসীম ভালোবাসতেন। তাই কোনো সময়েই তাঁর বিচ্ছেদ বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না।

হযরত ইউসুফ আ.-ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাঁর পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের মতো আল্লাহ তাআলার উচ্চ মর্যাদাশীল নবী হলেন। তিনি হানিফি ধর্মের দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব পালন করেন। তাই জীবনের শুরু থেকেই অন্য ভাইদের তুলনায় তাঁর প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত যোগ্যতা ছিলো সম্পূর্ণ পৃথক এবং বিশেষ ধরনের। হযরত ইয়াকুব আ. অত্যধিক মুহাব্বত ও ইশকের একটি কারণ এটাও ছিলো যে, তিনি হযরত ইউসুফ আ.-এর ললাটদেশের দীপ্তিমান 'নুরে নবুয়ত' চিনতেন। তিনি আল্লাহর ওহির মাধ্যমে তা জানতে পেরেছিলেন।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ আ.-এর উল্লেখ

পবিত্র কুরআন হযরত ইউসুফ আ.-এর নাম ছাব্বিশ বার উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে চব্বিশ বার কেবল সুরা ইউসুফে, এক জায়গায় সুরা আনআমে এবং এক স্থানে সুরা মুমিনুনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি এই গৌরবও অর্জন করেছেন যে, তাঁর প্রপিতামহ হযরত ইবরাহিম আ.-এর মতো তাঁর নামেও পবিত্র কুরআনে একটি সুরা (সুরা ইউসুফ) নাযিল হয়েছে। এতে হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনাবলি সম্পর্কে অনেক নসিহত ও উপদেশের সমাবেশ ঘটেছে।

সুরা	সুরার নাম	আয়াত
৬.	সুরা আনআম	৮৪
১২	সুরা ইউসুফ	৪,৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৭, ২১, ২৯, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৫৮, ৬৯, ৭৩, ৭৬,
সুরা	সুরার নাম	আয়াত
		৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯৪, ৯৯
৪০	সুরা মুমিনুন	৩৪

সুরা ইউসুফ

পবিত্র কুরআন সুরা ইউসুফের ঘটনাকে 'আহসানুল কাসাস' বলেছে। কারণ এই একটি ঘটনায় যে-পরিমাণ উপদেশ রয়েছে, যে-পরিমাণ নসিহত, হেকমত ও ওয়াজ নিহিত রয়েছে, অন্যকোনো সুরায় একই স্থানে তা এতবেশি পরিমাণে নেই। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটি তার নিজের বৈশিষ্ট্যের কারণে এক বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক কাহিনি এবং কালের উত্থান-পতনের একটি জ্বলন্ত স্মৃতি। এই একজনমাত্র ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বহু সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া এবং বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া, পতন ও উত্থানের এমন একটি সবাক চিত্র, যা কোনো ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। এটা যাযাবর গোত্রে এমন এক অদ্বিতীয় ও অমূল্য মুক্তার বিস্ময়কর ইতিহাস, আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তির অলৌকিকতা যাঁকে সেকালের বড় বড় সভ্য জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এবং তাদের ওপর শাসকসুলভ ক্ষমতাপ্রয়োগের জন্য মনোনীত করেছে এবং নবুওতের মর্যাদা দান করেছে।

পবিত্র কুরআন তাওরাতের মতো কিচ্ছা-কাহিনি বর্ণনা অথবা ব্যক্তি ও জাতিসমূহের ঐতিহাসিক অবস্থাবলির আলেখ্যপুঞ্জ নয়; বরং কুরআন যে-ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনা করে, তার সামনে একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, তা হলো উপদেশ ও নসিহত।

হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনায় অনুপম ও তুলনাহীন উপদেশ ও শিক্ষা নিহিত আছে। যেমন : সৎপথ প্রদর্শন ও হেদায়েতের গুরুত্ব, পরীক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা, আল্লাহ আদেশ-নিষেধের প্রতি সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত পেশ, ব্যক্তি ও জাতির উত্থান ও পতনের ঘটনাবলি, আল্লাহ তাআলার ইনসাফ ও রহমতের বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড, মানবসুলভ ক্রটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন, তার পরিণতি ও পরিণাম, নিষ্পাপতা ও সংযমের বিস্ময়কর ক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে তা 'আহসানুল কাসাস' (সর্বোত্তম কাহিনি) এবং অতীত গ্রন্থরাশির এমন সুন্দর পৃষ্ঠা যা নিজের সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় ও একক বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

পবিত্র কুরআন বলেছে—

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ () إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ () نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (سورة يوسف)

'আলিফ-লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। তা আমিই অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো। আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনি বর্ণনা করছি, ওহির মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ করে; যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ১-২]

সুরা ইউসুফের শানে-নুযুল সম্পর্কে হাদিসের রেওয়ায়েতসমূহ এবং মুফাস্সির উলামায়ে কেরামের উক্তিসমূহের সারমর্ম এই, মক্কা কাফেররা একবার রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ইহুদিদের সঙ্গে আলোচনা করলো যে, আমরা তো এই ব্যক্তির ব্যাপারে অস্থির ও অপারগ হয়ে পড়লাম। (আমাদেরকে কিছু পরামর্শ দিন।) এ-কথা শুনে ইহুদিরা তাদেরকে বললো, নবুওতের দাবিদার এই লোকটিকে উত্যক্ত করা এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য তোমরা তাকে এই প্রশ্ন করো যে, ইয়াকুব আ.-এর সন্তান-সন্ততি শাম (সিরিয়া) থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মিসরে গেলো কেনো? আর ইউসুফ আ. সম্পর্কিত ঘটনাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ কী? এই ব্যক্তি সত্যিকারের নবী না হলে কখনো এসব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারবে না।

মক্কার কাফেররা ইহুদিদের পরামর্শ অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো। তিনি আল্লাহর ওহির মাধ্যমে তাদেরকে সবকিছু শুনিয়ে দিলেন, যা সুরা ইউসুফে বর্ণিত আছে।

হযরত ইউসুফ আ.-এর স্বপ্ন এবং ইউসুফ আ.-এর ভাইগণ

এই ঘটনাগুলোর সারমর্ম এই যে, হযরত ইয়াকুব আ. নিজের সব সন্তান-সন্ততির মধ্যে হযরত ইউসুফ আ.-কে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। তাই হযরত ইসুফের প্রতি হযরত ইয়াকুব আ.-এর প্রেমিকসুলভ ইশক ও মুহাব্বত ইউসুফ আ.-এর ভাইদের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয় ছিলো এবং

তাঁরা সবসময় এই ভাবনাতেই নিরত থাকতেন যে, হয়তো তাঁরা ইয়াকুব আ.-এর হৃদয় থেকে এই ভালোবাসা দূর করে দিতে পারবেন। অথবা হযরত ইউসুফ আ.-কেই নিজেদের পথ থেকে সরিয়ে দেবেন। তাহলে সবকিছুরই অবসান ঘটে যাবে।

সেই ভাইদের হিংসাত্মক মনোভাবের ওপর অতিরিক্ত একটি চাবুক পড়লো। তা হলো, হযরত ইউসুফ আ. স্বপ্নে দেখলেন যে, এগারোটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র তাঁর সামনে সিজদা করছে। হযরত ইয়াকুব আ. প্রিয়পুত্রের এই স্বপ্ন-সংবাদ শুনে তাঁকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন, তুমি এই স্বপ্ন দ্বিতীয়বার কারো সামনে বর্ণনা করো না। এমন না হয় যে, তা শুনে তোমার ভাইয়েরা তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করে দেয়। কেননা, শয়তান সবসময় মানুষের পেছনে লেগে আছে আর তোমার স্বপ্নের ফল অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার।

পবিত্র কুরআন এই ঘটনাটি ব্যক্ত করেছে এভাবে—

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ () قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ () وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'স্মরণ করো, যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিলো, 'হে আমার পিতা, আমি তো দেখেছি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে, দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।' সে বললো, 'হে আমার বৎস, তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না; করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের[১] ব্যাখ্যা (স্বপ্নফল বর্ণনা) শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি তা (নবুওতের

---

[১] এখানে الأحاديث স্বপ-বৃত্তান্ত বোঝানো হচ্ছে।

নেয়ামত) পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৪-৬]

এখানে তাওরাত ও কুরআন মাজিদের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

ক. পবিত্র কুরআন বর্ণনা করছে, হযরত ইউসুফ আ. যখন নিজের স্বপ্ন হযরত ইয়াকুব আ.-কে শুনিয়েছিলেন, তখন ওখানে তাঁর অন্য ভাইয়েরা উপস্থিত ছিলেন না। আর তাওরাত বলে, এ-ব্যাপারটি ইউসুফ আ.-এর ভাইদের উপস্থিতিতেই ঘটেছিলো।

খ. কুরআন বলছে যে, হযরত ইয়াকুব আ. এই স্বপ্নের কথা শুনে হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁকে নবুয়ত ও আল্লাহ প্রদত্ত ইলমের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তাওরাত বলছে, ইয়াকুব আ. এই স্বপ্নের কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই স্বপ্ন-বর্ণনায় তোমার উদ্দেশ্য হয়তো এই যে, আমি ও তোমার মা এবং তোমার ভাইয়েরা তোমার সামনে সিজদায় পতিত হই।

ঘটনাবলির এই পর্যায়ক্রমের প্রেক্ষিতে, যা সামনে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনায় ঐক্যরূপ ধারণ করে, এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআনের বর্ণনাই সঠিক ও সত্য। তা ছাড়া স্বভাবগত চাহিদা এটাই দাবি করে যে, ইউসুফ আ. নিজের এই স্বপ্নটিকে ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে বর্ণনা করেন এবং হযরত ইয়াকুব আ. পুত্রের এই স্বপ্ন শুনে আনন্দিত হন। কেননা, সব পিতাই আপন সন্তানের পদোন্নতি ও মর্যাদার উচ্চতা কামনা করেন। বিশেষ করে, হযরত ইয়াকুব আ. নবী হওয়ার কারণে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ইউসুফ আ.-এর জন্য যে-উচ্চ মর্যাদা দেখছিলেন তা শত-সহস্র সুখ ও আনন্দের কারণ ছিলো। মনঃকষ্ট ও দুঃখের কারণ নয়।

অবশেষে একদিন হিংসার প্রজ্জ্বলিত আগুন হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইদেরকে ইউসুফ আ.-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বাধ্যই করে ছাড়ালো। পবিত্র কুরআন তা বর্ণনা করছে এইভাবে—

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ () إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ () اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ

أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ () قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

'ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। স্মরণ করো, তারা বলেছিলো, 'আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ ও তার ভাই-ই (বিনইয়ামিন আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়,[২] অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো অথবা তাকে কোনো স্থানে (দূরদেশে) ফেলে আসো, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি কেবল তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে (তাঁর মনোযোগ কেবল তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হবে) এবং তারপর তোমরা ভালো মানুষ হয়ে যাবে।' তাদের মধ্যে একজন বললো, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না এবং যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোনো কূপের গভীরে নিক্ষেপ করো, যাত্রীদলের কেউ (কোনো পথিক) তাকে তুলে নিয়ে যাবে।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৭-১০]

এই পরামর্শের পর তাঁরা সবাই একত্র হযরত ইয়াকুব আ.-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তাঁদের পিতাকে বললেন, আপনি ইউসুফকে আমাদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে পাঠান না কেনো? আমাদের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই। তার সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অধিক সংহত আর কে হতে পারে?

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ () أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (سورة يوسف)

'তারা এসে বললো, 'হে আমাদের পিতা, ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদের বিশ্বাস করছো না কেনো, অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী? তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করো, সে তৃপ্তিসহকারে খাবে এবং খেলাধুলা করবে। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ১১-১২]

---

[২] হযরত ইউসুফ আ. ও তাঁর ছোটভাই বিনইয়ামিন শৈশবে মাতৃহারা হওয়ায় ইয়াকুব আ. তাদেরকে অধিক স্নেহ করতেন। তা ছাড়া ইউসুফের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছিলেন। এ-কারণে তিনি ইউসুফের লালন-পালনের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন।

হযরত ইয়াকুব আ. বুঝতে পারলেন তাদের মনে দুরভিসন্ধি রয়েছে। তাঁরা হযরত ইউসুফের অনিষ্ট সাধনের জন্য পেছনে লেগেছেন। কিন্তু তিনি পরিষ্কার কথায় তাঁর সে মনোভাব প্রকাশ করলেন না। কেননা, তাতে তাঁর পুত্ররা বিগড়ে গিয়ে ইউসুফ আ.-এর সঙ্গে প্রকাশ শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয়ে যেতে পারেন। আর তিনি এটাও ভাবলেন যে, ইশারা-ইঙ্গিত করলে হয়তো তাঁরা নিজেদের অত্যাচারী ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হতে পারেন। কাজেই তিনি ইঙ্গিতে তাঁদের সামনে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিলেন, বাস্তবিকই আমি ইউসুফের ব্যাপারে তোমাদের পক্ষ থেকে আশঙ্কা করছি। পবিত্র কুরআনে তা ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে—

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (سورة يوسف) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (سورة يوسف)

'সে (ইয়াকুব) বললো, 'এটা আমাকে কষ্ট দেয় (দুঃখিত ও চিন্তান্বিত করে) যে, তোমরা তাকে (তোমাদের সঙ্গে) নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে, আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী (অসতর্ক) থাকবে।' [সুরা ইউসুফঃ আয়াত ১৩]

ইয়াকুব আ.-এর এ-কথা শুনে ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা সমস্বরে বলে উঠলো—

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (سورة يوسف)

'আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও তাকে যদি নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হবো। (আমরা তো তাহলে সবকিছুই খোয়ালাম।)' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ১৪]

এ-জায়গায় তাওরাতের বর্ণনা এই যে, হযরত ইয়াকুব আ. নিজেই নিজের আদেশে ইউসুফ আ.-কে তাঁর ভাইদের সঙ্গে ময়দানে খেলাধুলা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলো তাওরাতের এই বর্ণনাকে ভুল প্রমাণ করছে।

কিনআনের কূপ

মোটকথা, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা মাঠে খেলাধুলা করার বাহানা ইউসুফ আ.-কে মাঠে নিয়ে গেলেন। পূর্বের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা তাঁকে এমন একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন যাতে পানি ছিলো না। তা দীর্ঘকাল শুষ্ক অবস্থায় ছিলো। ভাইয়েরা বাড়িতে ফেরার সময় ইউসুফ আ.-এর জামায় কোনো জন্তুর রক্ত মাখিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হযরত ইয়াকুব আ.-এর কাছে এসে বললেন, আব্বা, আপনাকে আমাদের সত্যতা বিশ্বাস করানোর জন্য যতই চেষ্টা করি না কেনো, আপনি কখনো তা বিশ্বাস করবেন না। আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতায় একে অন্যের আগে গন্তব্যস্থানে পৌছানোর চেষ্টায় মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে উঠিয়ে নিয়ে গেলো। হযরত ইয়াকুব আ. ইউসুফ আ.-এর জামাটি দেখলেন। তাতে রক্ত মাখানো আছে ঠিকই; কিন্তু কোথাও কোনে ছেঁড়া ছিলো না। কিংবা জামার আঁচলও ফাঁড়া ছিলো না। ইয়াকুব আ. সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারলেন। কিন্তু তাঁদেরকে ধমক দেয়া বা তিরস্কার করা, নিন্দা করা, ঘৃণা করা বা অপদস্থ করা—কিছুই করলেন না। বরং তিনি নবীসুলভ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি, ধৈর্য ও মার্জনার সুরে বললেন, প্রকৃত অবস্থা গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও তোমরা তা গোপন করতে পারো নি।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (سورة يوسف)

'তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিলো। সে (ইয়াকুব) বললো, 'না, (তোমরা যা বলছো তা কখনোই নয়) তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনি সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছো, সে-বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (তাঁর কাছেই আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ১৮]

ইউসুফ আ. ও দাসত্ব

এখানে পিতা ও পুত্রদের মধ্যে এ-ধরনের কথাবার্তা চলছিলো আর ওদিকে হযরত ইউসুফ আ.-এর সঙ্গে ভিন্ন ঘটনা ঘটলো। হেজাযের ইসমাইলি

বংশের একটি কাফেলা শাম (সিরিয়া) থেকে দুগন্ধি-দ্রব্যাদি, সজ-মসলা ইত্যাদি বোঝাই করে মিসরে যাচ্ছিলো। কূপ দেখে তারা পানির জন্য বালতি ফেললো। ইউসুফ আ. মনে করলেন, হয়তো ভাইদের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়েছে। কাজেই তিনি বালতি ধরে লটকে থাকলেন। বণিকগণ বালতি উঠিয়ে ইউসুফ আ.-কে দেখেই চিৎকার করে বলে উঠলো—

يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ

'কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! (আমাদের হস্তগত হলো!)

তাওরাতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা যখন ইসমাইলি কাফেলাকে দেখলেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন যে, ইউসুফকে কূপ থেকে উঠিয়ে এই বণিকদের কাছে বিক্রি করে ফেলো। কিন্তু এর আগেই ইসমাইলি বণিকরা ইউসুফ আ.-কে কূপ থেকে বের করে তাদের দাস বানিয়ে ফেলেছে। আর জ্যেষ্ঠ ভাই রাওবিন যখন কূপের কাছে পৌছে দেখতে পেলেন যে ইউসুফ ওখানে নেই, কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন। রাওবিনকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ইয়াহুদা। রাওবিন প্রথম থেকেই এই ধারণায় ছিলেন যে, ইউসুফ আ.-কে কূপ থেকে বের করে এনে চুপে চুপে পিতার হাতে সোপর্দ করে দেবেন। এ-কারণেই তিনি ইউসুফকে হত্যা করে ফেলার ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন।

এখানে কোনো কোনো মুফাস্‌সির লিখেছেন যে, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরাই তাঁকে কূপ থেকে বের করে ইসমাইলি বণিক কাফেলার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো। কিন্তু মুফাস্‌সিরিনের এই বক্তব্যের সঙ্গে পবিত্র কুরআনও একমত নয়, তাওরাতও একমত নয়; বরং উভয়ের বর্ণনার দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, কাফেলার বণিকেরাই ইউসুফ আ.-কে কূপ থেকে উত্তোলন করে তাদের দাস বানিয়ে নিয়েছিলো।

একইভাবে বিখ্যাতগ্রন্থ 'কাসাসুল আম্বিয়া'র সংকলক তাওরাতের উপরিউক্ত বর্ণনায় আলোচ্য কাফেলা সম্পর্কে ভুল বুঝেছেন। তা এই যে, তিনি তাদেরকে ইসমাইলি ও মাদয়ানি দুটি ভিন্ন ভিন্ন কাফেলা মনে করেছেন। অথচ এটা ঠিক নয়। বরং বিষয় এই যে, এই কাফেলাটিই ছিলো শাম থেকে

মিসর গমনকারী কাফেলা। তারা বংশগত দিক থেকে ইসমাইলি এবং দেশের হিসেবে মাদয়ানি[৩] ছিলো।

মোটকথা, এইভাবে ইসমাইলি বণিকদের কাফেলা হযরত ইউসুফ আ.-কে তাদের দাস বানিয়ে নিলো এবং তাদের পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তাঁকেও মিসর নিয়ে গেলো। হযরত ইউসুফ আ.-এর জীবনের এই দিকটি তার মধ্যে নিহিত কত মহত্বের অধিকারী তা সেই ব্যক্তিই কেবল বুঝতে পারবেন, যাঁর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। বয়স অল্প। মা মৃত্যুবরণ করেছেন। পিতার ভালোবাসার কোলে ছিলেন। তাও ছুটে গেলো। জন্মভূমি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। নিজের ভাইয়েরা বিশ্বাসঘাতকতা করলো। স্বাধীনতার পরিবর্তে ভাগ্যে জুটলো দাসত্ব। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও কোনো শোরগোল নেই। কোনো বিলাপ নেই, মাতম নেই। অস্থিরতা ও উদ্বেগও নেই, কান্না ও রোলও নেই। ভাগ্যের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। বিপদে তিনি ধৈর্যশীল, আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট এবং তাঁর বিনয়ের মস্তক অবনত। বিক্রিত হওয়ার জন্য মিসরের বাজারে যাচ্ছেন। কবি সত্যই বলেছেন, (আল্লাহপাকের) সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের বিপদাপদ অনেক বেশি।

হযরত ইউসুফ আ. মিসরে

খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বে মিসরকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি মনে করা হতো। ওখানকার শাসক ছিলো আমালিকা গোত্রের হিকসুস। যেসময় হযরত ইউসুফ আ. কিনআন থেকে যাযাবর জাতির ক্রীতদাস হয়ে মিসরে প্রবেশ করলেন, তখন মিসরের রাজধানী ছিলো রাআমাসিস। এটা খুব সম্ভব ওই স্থানে অবস্থিত ছিলো যেখানে আজ 'সান' নামক বসতিটি আবাদ রয়েছে। ভৌগলিক বিবরণ অনুযায়ী এই স্থানটি পুবদিকে নীলনদের কাছে বলে কথিত। ফুতিফার ছিলেন মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং এক মর্যাদাবান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি ঘুরতে বের হয়ে মিসরের বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ-সময় ইউসুফ আ.-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তিনি অতি সাধারণ মূল্যে তাঁকে ক্রয় করে নেন।

---

[৩] হিজাযি।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, মিসরীয়রা তৎকালে নিজেদেরকে বিশ্বের সেরা সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতি বলে মনে করতো। তারা মরুবাসী যাযাবর গোত্রগুলোকে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতো। নিজেদের শহরে তাদের সঙ্গে অস্পৃশ্যের মতো ব ্যবহার করতো। এই গোত্রগুলোর মধ্যেই একটি গোত্র ইবরাহিমি বংশের স্মারক হয়ে কিনআনে বসবাস করতো। কিনআনে শহুরে পরিবেশ এবং স্থায়ী অধিবাসের নামচিহ্ন পর্যন্ত ছিলো না। শিকারের ওপর তাদের জীবনযাপন নির্ভর করতো। খড়ের ছাউনিযুক্ত ছোট ছোট কুটিরে তারা বসবাস করতো। আর বকরি-ভেড়ার তাদের ধন-সম্পদ।

এমতাবস্থায় ইউসুফ আ.-এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার অভাবনীয় কর্মকাণ্ড দেখুন। একজন গ্রামীণ মানুষ, তিনি আবার অল্প বয়স্ক ক্রীতদাস। তিনি একজন সুসভ্য, সংস্কৃতিবান, ধনাঢ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তির ঘরে ঠাঁই পান। তখন তিনি নিজের নিষ্পাপ জীবন, ধৈর্য ও গাম্ভীর্য, বিশ্বস্ততা এবং যোগ্যতার পবিত্র গুণাবলির বদৌলতে তাঁর প্রভুর চোখের জ্যোতি ও প্রাণের মালিক হয়ে ওঠেন। ফুতিফার তাঁর স্ত্রীকে বলেন, কুরআনের ভাষায়—

أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

'এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করো, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্ররূপেই গ্রহণ করতে পারি।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ২১]

এটা কী কারণে হলো? ইউসুফ আ.-এর মধ্যে এই পছন্দীয় চরিত্র ও স্বভাব কোথা থেকে এলো? একজন গ্রামীণ সন্তান কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন? একজন ক্রীতদাস কোন মুরব্বি থেকে এই পবিত্র স্বভাবের অধিকারী হলেন। এই প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে পবিত্র কুরআন জবাব দিচ্ছে—

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (سورة يوسف)

'সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমি তাকে হেকমত ও জ্ঞান দান করলাম (মীমাংসার ক্ষমতা ও ইলম) এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ২২]

যাইহোক। ফুতিফার হযরত হযরত ইউসুফ আ.-এর সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচার-ব্যবহার করেন নি; বরং আপন সন্তানের মতো সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে রাখলেন এবং নিজের জমিদারি, ধন-দৌলত ও গৃহজীবনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপর সোপর্দ করে দিলেন। এটা যেনো কিনআনের একজন

পশুপালকের ওপর অদূর ভবিষ্যতে যে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পিত হবে তারই সূচনা। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورة يوسف)

'এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সে-দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবার জন্য। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ২১]

আযিরের মিসরের স্ত্রী এবং ইউসুফ আ.

একজন বিখ্যাত সুফি ইবনে আতাউল্লাহ আস-সিকান্দারির উক্তি : ربما كمنت المنن في المحن ' অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়া বিপদাপদের মধ্যে নিহিত থাকে।' হযরত ইউসুফ আ.-এর গোটা জীবনটাই এই উক্তিরই বাস্তবায়ন-ক্ষেত্র। শৈশবকালের প্রথম বিপদ তাঁকে কিনআনের গ্রাম্য জীবন থেকে বের করে তাহযিব ও তামাদ্দুনের কেন্দ্রভূমি মিসরের এক অভিজাত ও শ্রেষ্ঠ পরিবারের মালিক বানিয়ে দিলো। একেই বলে 'দাসত্বের মধ্যে থেকে প্রভুত্ব করা'।

এখন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ও আরো কঠিন পরীক্ষা শুরু হলো। হযরত ইউসুফ আ. তখন পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করেছেন। রূপ ও সৌন্দর্যের এমন কোনো দিক ছিলো না যা তাঁর মধ্যে ছিলো না। তিনি ছিলেন মাধুর্য ও কমনীয়তার মূর্ত প্রতীক। চেহারা ছিলো চন্দ্র ও সূর্যের মতো দীপ্তিমান। নিষ্কলুষতা ও লজ্জার আধিক্য সোনায়-সোহাগার মত কাজ করছিলো। এসব গুণাবলি ছিলো তাঁর সবসময়ের সঙ্গী।

আযিযে মিসরের স্ত্রী নিজের হৃদয়কে আর বশে রাখতে পারলেন না। হযরত ইউসুফের রূপশিখার ওপর পতঙ্গের মতো কুরবান হতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহিম আ.-এর প্রপৌত্র, হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব আ.-এর চোখের জ্যোতি, নবী পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ, নবুওতের পদের জন্য মনোনীত। এমন মহাপুরুষের দ্বারা কেমন করে সম্ভব ছিলো যে

তিনি অপবিত্র ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হন এবং আযিযের স্ত্রীর অপবিত্র মনস্কামনা পূর্ণ করেন?

কিন্তু মিসরের সেই স্বাধীনা রমণী যখন দেখলেন, এভাবে হযরত ইউসুফের ওপর জাদু ক্রিয়া করছে না, তখন একদিন তিনি উন্মত্ত হয়ে ঘরের সব দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং ইউসুফ আ.-কে পীড়পীড়ি করতে শুরু করলেন— আমার কামবাসনা পূর্ণ করো। হযরত ইউসুফ আ.-এর জন্য এই সময়টুকু ছিলো কঠিন পরীক্ষার সময়। আযিযের স্ত্রী রাজ পরিবারের উদ্ভিন্ন যৌবনা রমণী, সৌন্দর্যশিখামণ্ডিত রক্তিম চেহারা, প্রেয়সী নয় বরং প্রেমিক, রূপ ও সাজ-সজ্জার এক অসহনীয় প্রদর্শনী, প্রেয়সীসুলভ ভাবভঙ্গির চাহনি। আর এদিকে হযরত ইউসুফ আ. নিজেও রূপবান নবযুবক, রূপ-সৌন্দর্যের মাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত। সব দরজা বন্ধ। অভিভাবক ও প্রভুর ভয়ের ব্যাপারে মিসরের রানি নিজেই দায়িত্বশীল। কিন্তু এতসব অনুকূল অবস্থা হযরত ইউসুফের হৃদয়ে এক মুহূর্তের জন্যও কি আযিযে মিসরের স্ত্রীর প্রতি বাসনা জাগিয়ে তুলেছিলো? তাঁর অন্তর কি শান্তভাব ত্যাগ করে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যে অধীর হয়ে উঠেছিলো? তাঁর নফস কি হৃদয়জগতে একমুহূর্তের জন্য কম্পন সৃষ্টি করেছিলো? না, কখনোই নয়। তার পরিবর্তে বরং পবিত্রতা ও নিষ্পাপতার প্রতিমূর্তি, নবুওতের আমানতদার, আল্লাহ তাআলার ওহি অবতীর্ণ হওয়ার স্থল এমন দুটি চিত্তাকর্ষক ও শক্তিশালী দলিল দ্বারা মিসরের সেই নারীকে বুঝিয়েছিলেন, যা হযরত ইউসুফ আ.-এর মতো ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্ভব ছিলো। যাঁর শিক্ষা ও প্রতিপালক সরাসরি আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে থেকেই হয়েছে।

তিনি আযিযে মিসরের স্ত্রীকে জবাব দিলেন, এটা অসম্ভব। আমি আল্লাহপাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তাঁরই নাফরমানি করবো যাঁর মহাপ্রতাপশালী নাম 'আল্লাহ' এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টজগতের মালিক? আর আমি কি আমার সেই মুরব্বি আযিযে মিসরের আমানতে বিশ্বাসঘাতকতা করবো যিনি আমাকে ক্রীতদাসরূপে রাখার পরিবর্তে এই সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন? যদি আমি এমন অশ্লীল কর্ম করি তাহলে তো জালিম বলে সাব্যস্ত হবো। আর জালিমদের জন্য পরিণামে কখনো মঙ্গল নেই।

কিন্তু আযিযে মিসরের ওপর এই নসিহতের কোনো ক্রিয়াই হলো না। বরং তিনি তাঁর কামনাকে কার্যকরী রূপদানের ওপরই গোঁ ধরে থাকলেন। তখন

হযরত ইউসুফ আ. তাঁর প্রতিপালকের সেই বুরহান বা প্রমানের প্রতি লক্ষ করে, যা তিনি উল্লেখ করেছেন, পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলেন—

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ () وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (سورة يوسف)

'সে (ইউসুফ আ.) যে-স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলো সে (স্ত্রীলোকটি) তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিলো ও বললো, 'এসো।' (এসো, আমার কাছে এসো।) সে বললো, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি[৪] (আযিযে মিসর) আমার প্রভু; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না।' সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলো এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন[৫] প্রত্যক্ষ করতো (যদি আল্লাহপাকের প্রমাণ দেখতে না পেতেন)। আমি তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা (অসৎ ইচ্ছা ও নির্লজ্জতা) থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিলো আমার বিশুদ্ধচিত্ত (খাঁটি) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ২৩-২৪]

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا বাক্যের তাফসির

মুফাস্সিরগণ এই আয়াতটির বিভিন্ন প্রকার তাফসির করেছেন। কিন্তু উপরে আমি যে-অর্থ করলাম তা-ই এই স্থানের সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। পবিত্র কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ঘটনায় আযিযে মিসরের স্ত্রীর অপবাদই বর্ণনা করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ আ.-এর বেলায় বর্ণনা করেছে পবিত্রতা ও উচ্চ মর্যাদার কথা। সুতরাং হযরত ইউসুফ আ.-এর مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি,

---

[৪] এখানে 'তিনি' অর্থে আল্লাহ, ভিন্নমতে আযিযে মিসর অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির স্বামী।

[৫] -এর আভিধানিক অর্থ দলিল। এখানে 'নিদর্শন' অথবা প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত বিবেকের

তিনি (আযিযে মিসর) আমার প্রভু; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না' কথাটি বলার পর এই অর্থই এখানে স্থানোপযোগী হতে পারে যে, ইউসুফ আ.-এর মুখে 'বুরহানে রব' (আল্লাহ তাআলার প্রমাণ) শোনার পরও যখন আযিযে মিসরের স্ত্রী নিজের জেদ থেকে বিরত হলেন না এবং কামনা পূর্ণ করার ব্যাপারেই গোঁ ধরে থাকলেন, তখন হযরত ইউসুফ আ. তাঁর কামনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বুরহানে রবের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কামনার আদৌ পরোয়া করলেন না। ফল হলো এই, ইউসুফ আ. তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন এবং আযিযে মিসরের স্ত্রীও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

এই তাফসিরই সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে প্রকৃত অবস্থাকে প্রকাশ করছে। পবিত্র কুরআনে এর দৃষ্টান্ত হলো হযরত মুসা আ.-এর মায়ের আলোচনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতটি—

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة القصص)

'মুসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিলো। যাতে সে আস্থাশীল হয় তার জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিতো। (কাজেই তিনি মুসা আ.-এর রহস্য প্রকাশ করতে পারেন নি।)' [সূরা কাসাস : আয়াত ১০]

এমনিভাবে হযরত ইউসুফ আ.-এর ক্ষেত্রেও অর্থ এই হয় যে, যদি ইউসুফ আ. আল্লাহ তাআলার প্রমাণ লাভ না করতেন, তবে তিনি অসদিচ্ছা করে ফেলতেন; কিন্তু তিনি অসদিচ্ছা করেন নি। কারণ তিনি সেই বুরহানে রব দেখেছিলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সেই বুরহানে রব বা আল্লাহর প্রমাণ কী ছিলো যা পবিত্র কুরআন এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছে? তার জবাব এই যে, পবিত্র কুরআন তার সময়োচিত ও স্থানোচিত মার্জিত ও অলৌকিক ভাষায় নিজেই এমনভাবে বিষয়টি বর্ণনা করে দিয়েছে যে, এখানে প্রশ্নের কোনো অবকাশই থাকে না। দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর হযরত ইউসুফ আ. আযিযের স্ত্রীকে যে-জবাব দিয়েছিলেন, এমন জটিল পরিস্থিতিতে এর চেয়ে উত্তম

জবাব আর কী হতে পারে? সুতরাং এটাই সেই বুরহানে রব যা হযরত ইউসুফ আ.-কে দান করা হয়েছিলো এবং যা ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতাকে নিষ্কলুষ রেখে দিয়েছে। এ-কারণেই পবিত্র কুরআন তার পরে বেশ জোরোশোরে বর্ণনা করেছে—

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوٓءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

'এমনিভাবে আমি তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিলো আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।'
[সুরা ইউসুফ : আয়াত ২৪]

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ. এ-জাতীয় অসদিচ্ছা থেকে এ-কারণে পবিত্র থাকলেন যে, প্রথম থেকেই আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্রতার ফয়সালা করে রেখেছিলেন। সুতরাং তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে থাকার পর এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে, সেই পবিত্রতার বিপরীতে অপবিত্রতার গন্ধও তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়? এটা ছিলো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মূলকথা এই যে, হযরত ইয়াকুব আ.-এর ছবি দৃষ্ট হওয়া এবং তাঁর ইঙ্গিতে নিষেধ করা; ফেরেশতা প্রকাশিত হয়ে ইউসুফ আ.কে ওই কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা; অথবা আযিযে মিসরের ঘরে রক্ষিত মূর্তির ওপর তাঁর স্ত্রীর পর্দা ফেলে দেয়া এবং তা থেকে হযরত ইউসুফ আ.-এর উপদেশ লাভ করা— এই কয়েকটি এবং এ-জাতীয় যাবতীয় ব্যাখ্যার বিপরীতে 'বুরহানে রব'-এর উত্তম তাফসির হলো যা স্বয়ং পবিত্র কুরআনের বাক্য ও বর্ণনাক্রম থেকে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ ১. ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমানের সত্যিকারের কল্পনা বা মনঃছবি; ২. অপ্রকৃত বা রূপকার্থক মুরব্বির অনুগ্রহকে অনুগ্রহ বলে বুঝতে পারা এবং বিশ্বস্ততাগুণ। আযিযে মিসর হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, একে সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে রেখো। হযরত ইউসুফ আ. এ-কথার প্রতি লক্ষ করেই আযিযের স্ত্রীকে বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে যিনি (আযিযে মিসর) আমাকে মর্যাদার সঙ্গে থাকার স্থান করে দিয়েছেন এবং সম্মান দিয়েছেন, এটা কেমন করে সম্ভব হবে যে, আমি তাঁর আমানতে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে লোকচক্ষুতে হেয় ও অপদস্থ করি?

যাইহোক। হযরত ইউসুফ আ. যখন দরজার দিকে দৌড়ালেন, আযিযে মিসরের স্ত্রীও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ালেন। কোনোভাবে দরজা খুলে গেলো। দরজার সামনেই দেখতে পেলেন আযিযে মিসর ও তাঁর স্ত্রীর চাচাতো

ভাই দাঁড়িয়ে আছেন। এই রমণীর ইশক তখনো ছিলো অপরিপক্ব। তাই তিনি সঠিক অবস্থা বর্ণনা করতে সক্ষম হলেন না; বরং তিনি প্রকৃত সত্য গোপন করার উদ্দেশে ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যে-ব্যক্তি এমন কুকর্মের ইচ্ছা পোষণ করে তার সাজা কারাগার বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কী হতে পারে? হযরত ইউসুফ আ. আযিযে মিসরের স্ত্রীর প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামূলক উক্তি শুনে বললেন, এটা তো তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিনি নিজেই আমার সঙ্গে অসদিচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু আমি কোনোভাবেই তাঁয় ইচ্ছায় সাড়া দিই নি এবং পালিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। তিনি আমার পেছনে পেছনে দৌড়ে এসেছেন এবং আপনাকে সামনে দেখে মিথ্যা বলতে শুরু করলেন।

আযিযে মিসরের স্ত্রীর চাচতো ভাই অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং চতুরও ছিলেন। তিনি বললেন, ইউসুফের জামা দেখতে হবে। তা যদি সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদী আর যদি তা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে ইউসুফের কথাই সত্য এবং স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদী। দেখা গেলো ইউসুফ আ.-এর জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া। আযিযে মিসর প্রকৃত অবস্থা বুঝে ফেললেন। কিন্তু নিজের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে বিষয়টির যবনিকা টেনে দিয়ে বললেন, ইউসুফ, তুমি সত্যবাদী এবং এই নারীর ব্যাপারটি ক্ষমা করো। এই বিষয়টিকে এখানেই শেষ করে দাও। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এসব তোমারই প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। তোমাদের স্ত্রী জাতির ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা অত্যন্ত জটিল। নিঃসন্দেহে তুমিই অপরাধী। সুতরাং তুমি তোমার এই কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং মাফ চাও।

পবিত্র কুরআন ঘটনাটি ব্যক্ত করছে এভাবে—

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ () قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ () وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ () فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ

مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ () يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (سورة يوسف)

'তারা উভয়ে (হযরত ইউসুফ আ. এবং আযিযে মিসরের স্ত্রী) দৌড়ে দরজার দিকে গেলো এবং স্ত্রীলোকটি পেছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেললো, তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেলো। স্ত্রীলোকটি বললো, 'যে তোমার পরিবারের সঙ্গে কুকর্ম কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্যকোনো মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কী দণ্ড হতে পারে?' ইউসুফ বললো, 'সেই আমার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলো।' স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো, 'যদি তার জামার সামনের দিক থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী; কিন্তু তার জামা যদি পেছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।' গৃহস্বামী যখন দেখলো যে, তার (ইউসুফের) জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বললো, 'নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ। হে ইউসুফ, তুমি তা উপেক্ষা করো (ব্যাপারটি ক্ষমা করো) এবং হে নারী, তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো; তুমিই তো অপরাধী।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৫-২৯]

আযিযে মিসর অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি এখানে খতম করে দিলেও আসল বিষয় কিন্তু গোপন থাকলো না। এক এক করে শহরের অভিজাত পরিবারগুলোর সব স্ত্রীলোকই এটার চর্চা করতে লাগলো যে, আযিযে মিসরের স্ত্রী কত নির্লজ্জ! নিজের দাসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এত উচ্চ মর্যাদাবতী নারীর দাসের সঙ্গে মেলামেশা! ধীরে ধীরে এই গোপনীয় নিন্দচর্চার খবর আযিযে মিসরের স্ত্রীর কাছেও পৌছে গেলো। অভিজাত নারীদের সমালোচনা তাঁর জন্য অত্যন্ত মনঃপীড়াদায়ক হলো। তিনি সংকল্প করলেন, অবশ্যই এর প্রতিশোধ নিতে হবে এবং এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে হবে, যাতে তারা আমাকে যে-ব্যাপারে ভর্ৎসনা করছে, তাদেরকেও সে-ব্যাপারে লিপ্ত করে দেয়া যায়। এসব চিন্তা করে তিনি একদিন শহরের অভিজাত পরিবারের এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্ত্রীগণকে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁরা সবাই এসে দস্তরখানে বসলেন এবং খাদ্য গ্রহণের জন্য ছুরি হাতে

নিলেন। যেনো গোশত, লেবু ইত্যাদি বস্তু কাটতে পারেন। তখন আযিযে মিসরের স্ত্রী ইউসুফকে ঘর থেকে বাইরে আসার জন্য নির্দেশ করলেন। হযরত ইউসুফ আ. প্রভুপত্নীর আদেশে বাইরে বের হয়ে এলেন। উপস্থিত রমণীরা ইউসুফ আ.-এর রূপ-লাবণ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তাঁর দীপ্তিমান চেহারার দীপ্তি ও জ্যোতিতে এতটাই প্রভাবিত হলেন যে, ছুরি দিয়ে আহার্য বস্তু কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাতই কেটে ফেললেন। অজ্ঞাতসারে হঠাৎ তাঁরা বলে উঠলেন, কে বলে ইনি মানুষ? ইনি তো নুরের পুতুল এবং সম্মানিত ফেরেশতা। তাঁদের এই অবস্থা দেখে আযিযে মিসরের স্ত্রী খুবই আনন্দিত বোধ করলেন। তিনি নিজের সফলতা ও অন্য নারীদের পরাজয় দেখে বলতে লাগলেন, ইনিই তো সেই ক্রীতদাস যাঁর প্রতি ইশক ও মুহাব্বতের ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনার উপযুক্ত মনে করেছো। বিদ্রূপবাণের লক্ষ্যস্থল করে রেখেছো। এখন তাকে দেখে তোমাদের অবস্থা এমন কেনো? তোমরা বলো, আমার এই ইশক সঙ্গত না-কি অসঙ্গত? আর তোমাদের তিরস্কার ঠিক ছিলো না-কি বেঠিক?

এই ঘটনা কুরআনের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ (سورة يوسف)

'আর (সেই বিষয়টির চর্চা শহরে খুব প্রসারিত হয়ে পড়লো এবং) শহরে কয়েকজন নারী বললো, 'আযিযের (গৃহস্বামীর নাম বা পদবি) স্ত্রী তার যুবক দাস থেকে অসৎকর্ম কামনা করছে, (তাকে সে প্রেমের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে) প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।' স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো তখন সে তাদের ডেকে পাঠালো, তাদের জন্য (বিস্তৃত) আসন প্রস্তুত করলো, (যথারীতি)

তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিলো[৬] এবং ইউসুফকে বললো, 'এদের সামনে বের হও।' তারপর তারা যখন তাকে দেখলো, তার গরিমায় অভিভূত হলো (তারা তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলো) এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। (হঠাৎ) তারা (চিৎকার করে) বললো, 'অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য, এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।' সে (আযিযের স্ত্রী) বললো, 'এ-ই সে যার সম্পর্কে তোমরা আমার নিন্দা করেছো। (ইনিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছো।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩০-৩২]

আযিযে মিসরের স্ত্রী এটাও বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে আমি তার হৃদয়কে বশে আনতে চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু সে সংযমহীন হয় নি। তারপরও আমি এটা বলে দিচ্ছি, সে যদি শেষ পর্যন্ত আমার কথা মান্য না করে, অর্থাৎ আমার বাসনা পূর্ণ না করে, তাহলে তার অবস্থা অবশ্যই এমন হবে যে, তাকে কারাগারে আবদ্ধ থাকতে হবে এবং সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (سورة يوسف)

'আমি তো তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি। (তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছি।) কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে, তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩২]

হযরত ইউসুফ আ. আযিযে মিসরের স্ত্রীর এসব কথা শুনলেন। তা ছাড়া তিনি নিজের ব্যাপারে অন্য রমণীদেরও হাবভাব দেখতে পেলেন। তখন প্রার্থনার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ, এই নারীরা আমাকে যে-বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছে, তার তুলনায় আমি কারাগারে বসবাস করাকে হাজারগুণ শ্রেয় মনে করি। যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে এটা বিচিত্র নয় যে, আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে

---

[৬] তাদেরকে ফলমূল পরিবেশন করা হয়েছিলো এবং সেগুলোকে কেটে খেতে ছুরি দেয়া হয়েছিলো।

যাবো।' আল্লাহ তাআলার দরবারে হযরত ইউসুফ আ.-এর এই দোয়া কবুল হলো এবং আল্লাহ সেই রমণীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও ছলনাকে নস্যাৎ করে দিলেন। সফলতার মুকুট হযরত ইউসুফ আ.-এর মাথার ওপরই থাকলো। পবিত্র কুরআনে বিষয়টির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে—

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورة يوسف)

'ইউসুফ বললো, 'হে আমার প্রতিপালক, এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' তখন তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৩৩-৩৪]

এই ঘটনায় একটি বাক্য উল্লেখ আছে যে, وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ 'নিমন্ত্রিত রমণীরা নিজেদের হাত কেটে ফেললো।' সাধারণভাবে মুফাস্‌সিরগণ সবাই এই বাক্যের তাফসির তাফসির করেন এমন যে, হযরত ইউসুফ আ.-এর রূপ-ঔজ্জ্বল্য দর্শনে আত্মহারা হয়ে রমণীদের অবস্থা বাস্তবিকই এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, তাঁদের নিজেদের সত্তা সম্পর্কে কোনো খেয়ালই ছিলো না। ফলে তাঁরা কাটবার বস্তুর পরিবর্তে আপন আপন হাতই কেটে ফেললেন।

কিন্তু কোনো কোনো আধুনিক মুফাস্‌সির[১] বলেন, উপরিউক্ত তাফসির যথার্থ নয়। তাঁর মতে, মিসরীয় রমণীদের এটাও একটা ছলনা ও কুটিলতা ছিলো। তাঁরা ইউসুফ আ.-কে নিজেদের দিকে আকর্ষিত করার জন্য বলতে চাচ্ছিলেন, আমরা তোমার রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি এতটাই মোহিত যে, তোমার চেহারা দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতি লোপ পেয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা আমাদের হাত যখম করে ফেলেছি। এই তাফসিরের সমর্থনে তিনি প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন: وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ 'আপনি

---

[১] মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তরজুমানুল কুরআন, সুরা ইউসুফ।

যদি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ. তাঁদের হাত কেটে ফেলার অবস্থাকে كَيْدٌ (ষড়যন্ত্র) বলে ব্যক্ত করেছেন। যদি এটা অনিচ্ছাকৃত অবস্থা হতো তবে তাঁরা নির্দোষ সাব্যস্ত হতেন। এমতাবস্থায় রমণীদের কর্মপদ্ধতিকে ষড়যন্ত্র নামে আখ্যায়িত করার অর্থ কী? ত ছাড়া যখন মিসরের বাদশাহ হযরত ইউসুফ আ.-কে কারাগার থেকে বের করে আনার নির্দেশ প্রদান করলেন, তখনো হযরত ইউসুফ আ. বলেছিলেন—

ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (سورة يوسف)

'তুমি তোমার প্রভুর (বাদশহর) কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো যে-নারীরা হাত কেটে ফেলেছিলো তাদের অবস্থা কী? নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫০]

আযিযে মিসরের কাছে হযরত ইউসুফ আ.-এর সততা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিলো। তাঁর কোনো ধরনের ইচ্ছা ছিলো না যে ইউসুফ আ.-এর কোনো ক্ষতি হোক। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাঁধে ইশক ও প্রেমের ভূত বেশ সাংঘাতিকভাবেই চেপে বসেছিলো। যখন তিনি দেখলেন, খোশামোদ, ছল-চাতুরি, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রে, কোনো প্রকারেই তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হচ্ছে না, তখন তিনি হুমকি-ধমকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তা সত্ত্বেও যখন দৃঢ়তার পর্বতে কোনো কম্পন সৃষ্টি হলো না। আযিযে মিসর ইউসুফ আ.-এর সততার যাবতীয় নিদর্শন দেখা ও বুঝা সত্ত্বেও নিজের স্ত্রীর অপমান ও দুর্নাম হচ্ছে দেখে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ইউসুফকে এক নির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারে আটক করে রাখা হোক। যেনো এই বিষয়টির কথা মানুষের মন থেকে মুছে যায় এবং এই নিন্দাচর্চা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে হযরত ইউসুফ আ.-কে জেলখানায় যেতে হলো।

এ-ক্ষেত্রে হযরত শাহ আবদুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলবি রহ. লিখেছেন, ইউসুফ আ. তাঁর দোয়ার সঙ্গে এটাও বলেছিলেন, 'তাদের এই নির্লজ্জতার আহ্বানের মোকাবিলায় কারাগারই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।' তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে তো স্ত্রীলোকদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন; কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে কারগার নির্ধারণ করে দিলেন। তাঁর উচিত ছিলো এই বাক্যটি না

বলা। বরং তাঁর উচিত ছিলো পরীক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশাকে আহ্বান না করা। হযরত শাহ দেহলবি সাহেব (নাউওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু)-এর এই সূক্ষ্ম কথাটিকে শক্তিশালী করার জন্য অপর একজন তত্ত্বজ্ঞানী মুফাস্সির একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার মর্মার্থ এই : এক ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতো—

اللهم إني أسئلك الصبر

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ধৈর্য প্রার্থনা করছি।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির এই দোয়া শুনে বললেন, 'কেনো তুমি বিপদ-আপদ প্রার্থনা করছো? এটা না করে বিপদ-আপদ থেকে নিরাপত্তায় রাখার প্রার্থনা কেনো করছো না?'

এই দুইজন বুযর্গের উচ্চ মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে যদিও তাঁদের কথার ওপর সমালোচনা করতে আমার সাহস হচ্ছে না, তারপরও হযরত ইউসুফ আ.-এর মতো একজন উচ্চস্তরের নবীর জীবনের এই মহৎকাজকে একটি তত্ত্বকথার সামনে কুরবান হয়ে যেতে দেখে আর থাকা গেলো না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হয় যে, হযরত ইউসুফ আ.-এর السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي 'এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়' বাক্যটিতে তাঁর মর্যাদার উচ্চতা, আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য, দীন ও আমলে দৃঢ়তা, সত্যের ওপর দৃঢ় সংকল্প এবং আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকা ও আত্মসমর্পণের গুণাবলির এমন অনুপম প্রকাশ রয়েছে, যা তাঁর মতো উচ্চশ্রেণির নবীরই কাজ।

গভীরভাবে চিন্তা করুন, আযিযে মিসরের স্ত্রী-গৃহকর্ত্রী খোশামোদ ও ছল-চাতুরির এমন কোনো পন্থা নেই যা তিনি হযরত ইউসুফ আ-কে বশীভূত করার জন্য ব্যবহার করেন নি। তাতে বিফল হওয়ার পর অবশেষে অন্য রমণীদেরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিজেদের মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের কৌশল ইউসুফ আ.-এর ওপর প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু তারা বিফলই রয়ে গেছেন। সবশেষে আযিযের স্ত্রী এই হুমকি দিলেন যে, ইউসুফ আ. হয়তো তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন, অন্যথায় তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ থাকতে হবে। এ-অবস্থায় একজন আল্লাহভক্ত বান্দা, সৎকর্মে দৃঢ়সংকল্প ও আস্থায় অবিচল ব্যক্তি এবং আল্লাহর ভীতিকে সমগ্র সৃষ্টির ক্রোধ ও কোপের

ওপর প্রধান্য প্রদানকারী মানুষ এর চেয়ে উত্তম জবাব আর কী দিতে পারতেন যে, হে আল্লাহ, আমি এই গর্হিত ও নির্লজ্জ কাজের মোকাবিলায় কারগারকেই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার প্রদান করছি। কারাগার ও বন্দিদশা আমি মঞ্জুর করতে রাজি আছি; কিন্তু আপনার নাফরমানি ও অবাধ্যতা আমি কিছুতেই মঞ্জুর করবো না। কেউ কি এ-কথা বলতে পারেন যে, এটা কারাগারের জন্য প্রার্থনা, বন্দি হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ, দুঃখ ও দুর্দশাকে আহ্বান? কখনো নয়। বরং এখানে তো সূক্ষ্ম উপায়ে এমন কথা বলা হচ্ছে যা সত্যের ঘোষণা এবং আল্লাহর দরবারে পৌঁছার সঠিক স্তর।

হযরত ইউসুফ আ. এটাও পছন্দ করেন নি যে, আযিযে মিসরের পত্নীকে সম্বোধন করেন অথবা নিমন্ত্রিত রমণীদের তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ প্রদান করেন; বরং তিনি তাঁর আল্লাহকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি সেসব বিভ্রান্ত ও অসৎ স্বভাবের রমণীদের কাছে এ-বিষয়টি প্রকাশ করে দেয়া জরুরি মনে করলেন, যেভাবে তোমাদের ছল-চাতুরি, প্রবঞ্চনা ও খোশামোদ বিফল হয়েছে, তেমনি তোমাদের হুমকি-ধমকি ও শাস্তিও আমার সত্যের সংকল্প ও আল্লাহর সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষাকে বাতিল করতে পারবে না। আযিযে মিসরের স্ত্রী বলেছেন, 'ইউসুফ হয়তো আমার মনস্কাম পূর্ণ করবে, অন্যথায় তাকে কারাগারে বন্দিদশা বরণ করতে হবে।' সুতরাং আমি তাঁর অসদিচ্ছার মোকাবিলায় কারগারকেই লক্ষবার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবো। السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي

এখন বলুন, এই সত্যের ঘোষণা ও দৃঢ়তা প্রকাশের সঙ্গে সেই দোয়ার কী সম্পর্ক যাতে এক ব্যক্তি অনর্থক নিজের জন্য 'ধৈর্য' প্রার্থনা করে নিজের দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হওয়ার আহ্বান করছিলো? এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষাও ছিলো না, বিপদ-আপদও ছিলো না; বরং অযথা বালা-মুসিবত ডেকে আনছিলো। আর ইউসুফ আ.-এর ক্ষেত্রে পরীক্ষা মস্তকের ওপর, বিপদ বিদ্যমান, শাস্তিরও হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে, আপদ নাযিল করার ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে, এমন নিদারুণ অবস্থায় কি শুধু এই জবাব দেয়াই যথেষ্ট হতো যে, হযরত ইউসুফ আ. আযিযে মিসরের স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছেন? আর কিছুই বলার প্রয়োজন ছিলো না? যদি এমনই হতো, তবে পরীক্ষা, সঙ্কট,

বালা-মুসিবতের সময় দৃঢ়তা ও সত্যের ঘোষণা, সাহসিকতা ও নির্ভীকতা এবং দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-মত্ততার সামনে আল্লাহর কালিমাকে উচ্চ করে ধরার সবক কে শেখাতেন? দৃঢ় সংকল্পের জীবন-যাপনের পদ্ধতি কে বলে দিতেন? বাতিলের সামনে দুঃসাহসিকতার শিক্ষা কার কাছ থেকে পাওয়া যেতো এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যের অবস্থা কে সৃষ্টি করতো?

ইউসুফ আ. কারাগারে

যাইহোক। হযরত ইউসুফ আ.-কে কারাগারে প্রেরণ করা হলো। একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী, একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী বানিয়ে দেয়া হলো। তা করা হলো এজন্য, যাতে আযিযে মিসরের স্ত্রী অপমান ও দুর্নাম থেকে রক্ষা পান এবং অপরাধীকে কেউ অপরাধী না বলতে পারে।

তাওরাতে বর্ণিত আছে যে, 'হযরত ইউসুফ আ.-এর ইলম ও আমলের জ্যোতি কারাগারেও গোপনীয় থাকতে পারে নি। কারাগারের রক্ষক ইউসুফ আ.-এর শিষ্যত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন কারাগারের যাবতীয় আইন-শৃঙ্খলার বিধান ও সমাধান তাঁর হাতে ছেড়ে দিলো। ফলে কারাগার সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্বাধীন পরিচালনাধীন চলে এলো। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওখানেও তাঁর যাবতীয় কাজে সৌভাগ্যবান করে দিলেন।'[৮]

পবিত্র কুরআন থেকেও এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর কারণ হলো এই, সেকালের কারগারগুলোর অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত ইউসুফ আ.-কাছে বন্দিদের অবাধ যাতায়াত এবং তাঁরা মহত্ব ও সৎ চরিত্রের স্বীকৃতি এটাই প্রমাণ করে যে, কারাগারে ইউসুফ আ.-এর পবিত্র গুণাবলির যথেষ্ট খ্যাতি ছিলো।

দাওয়াত ও তাবলিগ

ঘটনাক্রমে হযরত ইউসুফ আ.-এর সঙ্গে আরো দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের মধ্যে একজন বাদশাহর শরাব পরিবেশনকারী ছিলো, আর দ্বিতীয়জন ছিলো বাদশাহর পাকশালার দারোগা।[৯] একদিন এই বন্দি দুজন

---

[৮] তাওরাত, আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩৯, আয়াত ৩৩।

[৯] তাওরাত, আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪০, আয়াত ১।

ইউসুফ আ.-এর খেদমতে হাজির হলো। তাদের মধ্যে শরাব পরিবেশনকারী বললো, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি যে আমি শরাব প্রস্তুর করার জন্য আঙ্গুর নিংড়ে রস বের করছি। দ্বিতীয়জন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মাথার ওপর রুটির খাঞ্চা বহন করছি আর পাখিরা তা থেকে খাচ্ছে।
হযরত ইউসুফ আ. নবীর পুত্র ছিলেন। ইসলাম প্রচারের রুচি তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে সংমিশ্রিত ছিলো। তা ছাড়া আল্লাহপাক তাঁকেও নবুওতের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তাই সত্যধর্ম প্রচারই ছিলো তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও তিনি কারাগারে ছিলেন, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যকে তিনি কী করে ভুলতে পারেন? আর যদিও তিনি দুখ-দুর্দশায় ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার বিষয়টি ভুলে থাকেন তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? এ-সময়টিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নম্রতা ও মুহাব্বতের সঙ্গে তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে যেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্য থেকে নিঃসন্দেহে এটাই এক প্রকার ইলম যা তিনি আমাকে দান করেছেন। তোমাদের কাছে তোমাদের জন্য নির্ধারিত খাদ্য-দ্রব্য আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ফলাফল বলে দেবো। তবে আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি। তোমরা তা ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো এবং বোঝার চেষ্টা করো।
'আমি ওইসব মানুষের ধর্ম অবলম্বন করি নি যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রাখে না এবং আখেরাতের প্রতিও অবিশ্বাসকারী। আমি আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—ইয়াকুব, ইসহাক ও ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাম-এর ধর্মের অনুসরণ করেছি। আমি কখনো এমন করতে পারি না যে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত করি। এটা আল্লাহপাকের একটি অনুগ্রহ; এই অনুগ্রহ তিনি আমার প্রতি করেছেন এবং আরো বহু মানুষের প্রতি করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।'
'বন্ধুগণ, তোমরা এ-কথা ভেবে দেখেছো কি, ভিন্ন ভিন্ন একাধিক উপাস্য হওয়া উত্তম না আল্লাহ তাআলা, যিনি এক ও সবার ওপর পরাক্রমশালী? তোমরা তাঁকে ছাড়া আর যাদের ইবাদত করছো, তাদের স্বরূপ এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয় যে, তারা কেবল কয়েকটি নাম। এগুলোকে তোমাদের বাপ-দাদারা মনগড়া স্থির করে নিয়েছে। এগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলা কখনো কোনো সনদ নাযিল করেন নি। সর্বময় কর্তৃত্ব তো একমাত্র আল্লাহর

হাতেই রয়েছে। তিনি এই নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এটাই সত্যধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নির্বোধ, তা জানে না।'

এই ঘটনাকে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করছে এভাবে—

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ () مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورة يوسف)

'হে কারা-সঙ্গীদ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের নামের ইবাদত করছো, যে-নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো। এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নি। বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন কেবল তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে; এটাই শাশ্বত (ও সরল) দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৩৯-৪০]

হেদায়েত ও নসিহতের এই পয়গামের পর হযরত ইউসুফ আ. কারাসঙ্গী দুজনের স্বপ্নের ফলাফল বর্ণনার প্রতি মনোযোগ প্রদান করলেন। তিনি বললেন:

'বন্ধুগণ, তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি দেখেছে যে সে আঙ্গুর নিংড়ে রস বের করছে, সে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় বাদশাহর শরাব পরিবেশনে নিযুক্ত হবে। আর যেজন মাথার ওপর রুটি বহন করতে দেখেছে তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে ঠুকরে খাবে। যে-বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করেছিলে তা নির্ধারিত হয়ে পড়েছে। (বাদশহর) সিদ্ধান্তও এটাই।'

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে এভাবে—

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ () وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا

اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (سورة يوسف)

‘ইউসুফ বললো, ‘হে কারা-সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের দুইজনের একজন তার প্রভুকে শরাব পান করাবে এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হবে; এরপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। যে-বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছে তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।’ ইউসুফ তাদের মধ্য থেকে যে মুক্তি পাবে মনে করলো, তাকে বললো, ‘তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।’ কিন্তু শয়তান ওকে ওর প্রভুর কাছে তার বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিলো; সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে থাকলো।’ [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪১-৪২]

কথিত আছে যে, শরাব পরিবেশনকারী ও পাকশালার দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো যে, তারা পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছিলো। তদন্ত সমাপ্ত হওয়ার পর পাকশালার দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলো আর শরাব পরিবেশনকারী নির্দোষ সাব্যস্ত হলো। হযরত ইউসুফ আ. তাদের স্বপ্নের ফল বর্ণনা করার পর শরাব পরিবেশনকারী খালাস পাবে মনে করে বললেন, اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ‘তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা উল্লেখ করো।’ কিন্তু সে মুক্তি পেয়ে কারাগার থেকে বের হওয়ার পর নিজের কাজে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে ইউসুফ আ.-এর কথা তার মনেই থাকলো না। তার মনে পড়লো না যে সে কারাগারে কী প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলো। শয়তান তার মস্তিষ্ক থেকে সে-কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলো। এভাবে ইউসুফ আ.-কে কয়েক বছর কারাগারেই থাকতে হলো।

এখানে অধিকাংশ তাফসিরকারের সারমর্ম এই: اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ বাক্যে হযরত ইউসুফ আ.-এর উদ্দেশ্য ছিলো, তুমি বাদশাহকে বলো যে, একজন নির্দোষ ও নিরপরাধ মানুষকে অযথাই অপরাধী সাব্যস্ত করে কারগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এ-ধরনের ব্যাখ্যার পর তাঁরা এরূপ সূক্ষ্ম তর্ক উত্থাপন করেন যে, বিপদ ও প্রয়োজনের সময় যদিও মানুষ থেকে মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করা যথার্থ চেষ্টা ও আল্লাহরভক্তির বিরোধী নয়, কিন্তু তারপরও حسنات الأبرار سيئات المقربين ‘নেককার বান্দাদের কোনো কোনো ভালো কাজও আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের জন্য ভালো কাজ নয়।’ এ-বক্তব্য

অনুযায়ী, হযরত ইউসুফ আ.-এর মতো আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মহামানবের পক্ষে এটা সঙ্গত ছিলো না যে, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব উপকরণসমূহের ওপরও ভরসা রাখেন। বাদশাহর কাছে নিজের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের জন্য প্রার্থনা করেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ফয়সালা এটাই নির্ধারিত হলো যে, তাঁকে আরো কয়েক বছর কারাগারে রেখে দেবেন। শয়তান শরাব পরিবেশনকারীকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিলো যে, সে হযরত ইউসুফের কথা কিছুই উল্লেখ করতে পারলো না।

ইবনে জারির আত-তাবারি ও ইবনে মাসউদ আল-বাগাবি প্রাচীন কালের কোনো মুহাক্কিক আলেম থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি فَأَنْسَاهُ শব্দে ه সর্বনামটির দ্বারা হযরত ইউসুফ আ.-কেই উদ্দেশ্য করেন এবং এই অর্থ করেন, শয়তান ইউসুফকে ভুলিয়ে দিলো যে, তাঁর পক্ষে বাদশাহর সাহায্যের জন্য শরাব পরিবেশনকারীকে বলে দেয়া সঙ্গত কাজ নয়। কিন্তু ইবনে কাসির এই ব্যাখ্যাকে কঠোরভাবে খণ্ডন করে দিয়েছেন এবং এই তাফসিরকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। সামনে তাওরাত থেকে এ-প্রসঙ্গে যা-কিছু উদ্ধৃত করা হয়েছে, মনে করা হয় যে, ওই তাফসিরের ভিত্তি তাওরাতের ওইসব বর্ণনার ওপরই স্থাপিত।

উল্লিখিত তাফসিরের বিপরীত কোনো মুফাস্‌সির বলেন, ইউসুফ আ.-এর এই বাক্যটির মর্মার্থ এই যে, হযরত ইউসুফ আ. বলেছেন, বাদশাহর সামনে আমার কথা উল্লেখ করে বলো, এমন এক ব্যক্তি আমাদেরকে এইভাবে সত্যধর্মের শিক্ষা প্রদান করছে, তার নিজের ধর্মকে আমাদের ধর্ম থেকে পৃথক বলছে এবং তা প্রতিপাদনে উত্তম প্রমাণও পেশ করছে। তাঁরা এই তাফসিরের বিশুদ্ধতার পক্ষে নিদর্শন বর্ণনা করেন যে, এখানে পবিত্র কুরআনে ইউসুফ আ. ও তাঁর দুজন কারাসঙ্গীর মধ্যে মাত্র দুটি বিষয়ের আলোচনাই পাওয়া যাচ্ছে। একটি বিষয় হলো ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগ আর অপর বিষয়টি হলো স্বপ্ন ও তার ফলাফল বর্ণনা। তৃতীয় কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ কোনা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে এ-কথা প্রকাশ পায় না যে, হযরত ইউসুফ আ. সেই দুই ব্যক্তির সামনে নিজের কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন এবং এদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সুতরাং আগেভাগে উল্লেখ করা ব্যতীত এভাবে বলা 'তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা উল্লেখ করো' বাক্যে অস্পষ্টতার কী অর্থ? ত ছাড়া হযরত ইউসুফ আ.-এর

কারাগার থেকে বের হয়ে আসার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যদি এমনই হতো, তাহলে শরাব পরিবেশনকারীর স্মরণ হওয়ার পর এবং বাদশাহর স্বপ্নের ফল বলে দেয়ার পর বাদশাহ যখন তাঁর কারামুক্তির নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এলেন না কেনো? এবং তিনি কেনো বাইরের অবস্থার অনুসন্ধান ও তদন্ত করার দাবি পেশ করলেন? এই তদন্ত তো পরেও হতে পারতো এবং পবিত্রতা ও নির্দোষিতার মীমাংসা কারগারের বাইরে এসেও করা যেতো। আয়াতগুলোর পর্যায়ক্রমিক সন্নিবেশের প্রতি লক্ষ করলে এই তাফসিরই অগ্রগণ্যতা পাওয়ার যোগ্য।

এই ঘটনা তাওরাতে নিম্নোক্ত বাক্যসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে :

'তখন ইউসুফ আ. বললেন, এর ব্যাখ্যা এই যে, মনে করো, এই তিনটি ডাল তিনটি দিন। এখন থেকে তিনদিনের মধ্যে বাদশাহ তোমার মামলার রায় প্রদান করবেন এবং তোমাকে পুনরায় চাকরির পদ প্রদান করবেন। পূর্বে যেমন তুমি ফেরআউনের শরাব পরিবেশনকারী ছিলে, তেমনি আবারো তুমি শরাবের পেয়ালা ফেরআউনের হাতে দিবে। আর যখন তোমার অবস্থা ভালো তখন আমরা কথা স্মরণ করো এবং আমাকে এই কারগার থেকে মুক্তি দেয়াইও। কেননা, কাফেলার লোকেরা আমাকে ইরানিদের দেশ থেকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে এবং এখানেও আমি এমন কোনো কাজ করি নি যে, তারা আমাকে এই কারগারে রেখে দেবে।'[১০]

ফেরআউনের স্বপ্ন

হযরত ইউসুফ আ.-এর এই ঘটনা মিসরের ফেরআউনের যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই খান্দানটি উচ্চতর বংশ হিসেবে আমালিকা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ইতিহাসে এদেরকে হিক্‌সুস নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদের আদি মূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা রাখালদের একটি গোত্র ছিলো। নতুন যুগের অনুসন্ধানে জানা যায়, এই গোত্রটি আরব থেকে এসেছিলো। মূলে এরা যাযাবর আরবদেরই একটি শাখা ছিলো। তা ছাড়া প্রাচীন কিবতি ও আরবি ভাষার পারস্পরিক সাদৃশ্য এদের আরব হওয়ার অতিরিক্ত প্রমাণ।[১১]

---

[১০] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪০, আয়াত ১২-১৫।

[১১] তরজুমানুল কুরআন : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

মিসরের ধর্মীয় চিন্তাধারার ভিত্তিতে তাদের (হিক্‌সুস সম্প্রদায়ের) উপাধি ছিলো ফারা[১২]। কেননা, মিসরীয় দেবতাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র দেবতা ছিলো آمن راع 'আ-মান রা' (সূর্যদেবতা)। তৎকালীন বাদশাহ সূর্যদেবতার অবতার এবং فاراع 'ফারা' নামে আখ্যায়িত হতো। এই ফারাকেই হিব্রু ভাষায় فارعن 'ফা-রাআন' এবং আরবি ভাষায় فرعون 'ফেরআউন' বলা হতো। হযরত ইউসুফ আ.-এর সময়কার ফেরআউনের নাম ঐতিহাসিকগণ 'রাইয়ান' বলেছেন। মিসরীয় বর্ণনাসমূহে তাকে 'আ-ইয়ুনি' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

যাইহোক। হযরত ইউসুফ আ. তখনো কারাগারেই আছেন। ইতোমধ্যে সেই যুগের ফেরআউন একটি স্বপ্ন দেখলো : সাতটি খুব মোটাতাজা স্থূলকায় গাভী এবং সাতটি কৃশকায় গাভী। কৃশকায় ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও স্থূলকায় গাভীগুলোকে গিলে ফেললো। আরো দেখলো, সাতটি সতেজ ও সবুজ শস্যের শীষ আর সাতটি শুষ্ক শস্যেল শীষ। শুষ্ক শীষগুলো সতেজ শীষগুলোকে খেয়ে ফেললো। বাদশাহ ভোরে শয্যা ত্যাগ করে অত্যন্ত অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়লো। এমন বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক স্বপ্নের জন্য তার খুব অস্থিরতা হতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ সে দরবারের উপদেষ্টার কাছে স্বপ্নটি বর্ণনা করে তার ফলাফল জানতে চাইলো। সভাসদগণও তা শুনে বিচলিত ও অস্থির হয়ে পড়লো। যখন কেউই এই স্বপ্নের সমাধান করতে পারলো, তখন নিজেদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা গোপন করার জন্য বললো, বাদশাহ, এটা কোনো স্বপ্ন নয়, মনে বাজে কল্পনা। এর নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। আমরা প্রকৃত স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো বলতে পারি; কিন্তু মনে বাজে কল্পনাসমূহের সমাধান দিতে পারি না।

ফেরআউন সভাসদদের এই জবাবে তৃপ্ত হতে পারলো না। এ-সময় বাদশাহর শরাব পরিবেশনকারীর নিজের স্বপ্ন ও ইউসুফ আ.-এর ব্যাখ্যার কথা স্মরণ হলো। সে বাদশাহর দরবারে আরজ করলো, আমাকে একটু অবকাশ দিলে আমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এনে দিতে পারি। বাদশাহর অনুমতি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে কারাগারের উদ্দেশে ছুটলো এবং ইউসুফ আ.-কে বাদশাহর স্বপ্ন-

---

[১২] ফেরআউন।

বৃত্তান্ত শোনালো। সে বললো, আপনি এর সমাধান দিন। কেননা আপনি সততা ও পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রতীক। আপনিই এই স্বপ্নের ফলাফল বলতে পারবেন। এটা বিচিত্র নয় যে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমি যখন সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে যাবো, তিনি আপনার সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা উপলব্ধি করবেন।

হযরত ইউসুফ আ.-এর ধৈর্য ও আত্মমর্যাদাবোধের পূর্ণতা এবং উচ্চ মর্যাদার কথা চিন্তা করুন—শরাব পরিবেশনকারীকে তিরস্কারও করলেন না এবং কয়েক বছর যাবৎ তাঁর কথা ভুলে থাকার কারণে ধমকও দিলেন না। ইলম বিতরণেও তিনি কার্পণ্য করলেন না। এমনও ভাবলেন না যে জালিমরা বিনাদোষে আমাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছে। তারা যদি এই স্বপ্নের সমাধান না পেয়ে ধ্বংসাপ্রাপ্ত হয় সেটাই ভালো। সেটাই তাদের শাস্তি। না, এ-ধরনের কাজ তিনি করলেন না। তৎক্ষণাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। নিজের পক্ষ থেকে এ-প্রসঙ্গে সঠিক তদবিরও বলে দিলেন। শরাব পরিবেশনকারীকে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করে বললেন :

'এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এর তার ভিত্তিতে তোমাদের যা করতে হবে তা হলো—তোমরা এক নাগাড়ে সাত বছর ফসল ফলাবে এবং এই সাত বছর হবে তোমাদের সচ্ছলতার বছর। খেতের ফসল কাটার সময় যখন আসবে, সারা বছরের খাদ্যের জন্য যে-পরিমাণ শস্যের প্রয়োজন তা পৃথক করে ফেলবে। অবশিষ্ট শস্যগুলোকে তাদের শীষের মধ্যেই রেখে দিয়ো। শীষের মধ্যে রেখে দিলে সেগুলো কীট-পতঙ্গ থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং নষ্টও হবে না। এই সাত বছরের পর আর সাতটি বছর আসবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের এবং দুঃখ-দুর্দশার। এই সাত বছর তোমাদের পূর্বসঞ্চিত সমস্ত শস্য নিঃশেষ করে দেবে। এরপর আবার একটি বছর আসবে যখন যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। খেতের ফসল বেশ সবুজ ও সতেজ হবে। মানুষ নানা প্রকার ফল ও বীজ থেকে প্রচুর পরিমাণে রস ও তেল আহরণ করবে। অর্থাৎ, মোটাতাজা গাভীগুলো ও সতেজ শীষগুলো সচ্ছলতার সাত বছর আর দুর্বল ও কৃশকায় গাভীগুলো ও শুষ্ক শীষগুলো দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ-দুর্দশার সাত বছর। যা সচ্ছলতার সাত বছরে উৎপন্ন শাস্য খেয়ে নিঃশেষ করবে।

পবিত্র কুরআন উপরিউক্ত বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে—

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ () ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ () ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (سورة يوسف)

'ইউসুফ বললো, 'তোমরা একাধারে সাত বছর ফসল চাষ করবে। এরপর তোমরা যে-শস্য কাটবে তার মধ্যে যে-সামান্য পরিমাণ তোমরা (সারাবছর) খাবে, তা ব্যতীত সব শস্য শীষসহ রেখে দেবে; এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এই সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে লোকে তা (সচ্ছল অবস্থার সাত বছরে সঞ্চিত ও রক্ষিত খাবে; কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা (বীজ ইত্যাদির জন্য) সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত। তারপর আসবে এক বছর, সে-বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে[১৩]। [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৪৭-৪৯]

এটা পবিত্র কুরআনে আলঙ্কারিক মার্জিত ও অলৌকিক কালাম—একই বাক্যে হযরত ইউসুফ আ.-এর স্বপ্নফল বর্ণনা এবং সে-সম্পর্কিত তদবির একসঙ্গেই বর্ণনা করে দিয়েছে। এতে কথার মধ্যে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়ে নি।

শরাব পরিবেশনকারী বাদশাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করে এসব বিবরণ শোনালো। বাদশাহ ইতোপূর্বে তার মুখে হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রশংসার কয়েকটি বাণী শুনেছিলো। স্বপ্নফল বর্ণনার বিষয়টি দেখে বাদশাহ ইউসুফ আ.-এর ইলম, জ্ঞান, উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করে নিলেন এবং অ-দেখা বস্তুকে দেখতে চাওয়ার মতো আগ্রহী হয়ে বললেন, এমন ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

অবস্থা শুনে হযরত ইউসুফ আ. কারাগার থেকে বাইরে আসতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, এভাবে কারাগার থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য তো আমি প্রস্তুত নই। তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বলো, তিনি যেনো এই বিষয়টির অনুসন্ধান করেন—সেই স্ত্রীলোকদের কী

---

[১৩] يَعْصِرُونَ শব্দটির অর্থ ফল নিংড়ে রস বের করবে। এখানে তা বাগধারারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ প্রচুর ভোগ-বিলাস করবে।

হয়েছিলো যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিলো? প্রথমে এ-বিষয়টি পরিষ্কার হোক যে, তারা ছল-চাতুরি ও ষড়যন্ত্র করেছিলো আর মহান প্রতিপালক তো তাদের প্রবঞ্চনা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক অবগতই আছেন।

হযরত ইউসুফ আ. বিনা দোষে বিনা অপরাধে কয়েক বছর যাবৎ কারারুদ্ধ ছিলেন এবং বিনা কারণে তাঁকে কয়েদি বানানো হয়েছিলো। এখন বাদশাহ যখন দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে মুক্তির সুসংবাদ শুনালেন, উচিত ছিলো তখন তিনি আনন্দচিত্তে উৎফুল্ল হয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে আসেন। কিন্তু এই কাজ তিনি করলেন না; বরং তিনি বিষয়ের অনুসন্ধান দাবি করলেন। এর কারণ, হযরত ইউসুফ আ. নবী বংশের সন্তান ছিলেন এবং তিনি নিজেও ছিলেন একজন মনোনীত নবী। এজন্য তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানের পূর্ণ মাত্রারই অধিকারী। তিনি ভাবলেন, আমি যদি বাদশাহর আমার প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে মুক্তি পেয়ে যাই তাহলে এটা আমার প্রতি বাদশাহর করুণা ও মেহেরবানি বলে বিবেচিত হবে। অথচ আমার নির্দোষিতা ও পবিত্রতা পর্দার অন্তরালে থেকে যাবে। আর এভাবে কারাগার থেকে মুক্ত হলে কেবল আত্মসম্মানবোধেই আঘাত লাগবে না, বরং দীনের দাওয়াত ও তাবলিগের মহা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং, এখনই আসল ব্যাপারটি সামনে উপস্থিত করার এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার উপযুক্ত সময়।

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের বর্ণিত হাদিসে আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-ঘটনাটির উল্লেখ করে ইউসুফ আ.-এর ধৈর্য ও দৃঢ়তার খুব প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে বিনয় ও নতির শেষ সীমা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন—

وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ

'আমি যদি এত দীর্ঘকাল কারাগারে অবস্থান করতাম, যত দীর্ঘকাল ইউসুফ আ. কারাগারে ছিলেন, তবে তৎক্ষণাৎ আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম (কারাগার থেকে বের হয়ে আসতাম)।'[১৪]

এখানে এ-বিষয়টিও লক্ষ করার যোগ্য যে, হযরত ইউসুফ আ.-এর ব্যাপারটি আযিযে মিসরের স্ত্রীর সঙ্গে ঘটলেও তিনি তা উল্লেখ করেন নি; বরং তিনি

---

[১৪] সহিহ বুখারি : হাদিস ৩৩৭২।

সেই মিসরীয় রমণীদের কথা বললেন যারা হাত কেটে ফেলেছিলো। হযরত ইউসুফ আ. কেনো এমন করলেন? এর দুটি কারণ ছিলো : একটি এই যে, হযরত ইউসুফ আ. যদিও আযিযে মিসরের স্ত্রীর কারণেই অধিক কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু কারাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রে সেই রমণীদেরও ষড়যন্ত্র ছিলো। কেননা, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি আশিক ছিলো এবং তাঁকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অভিলাষী ছিলো। অবশেষে বিফল মনোরথ হওয়ার পর সবাই মিলে আযিযে মিসরের স্ত্রীকে ইউসুফ আ.-কে কারাগারে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করেছে এবং সেটাকে কাজে পরিণত করে ছেড়েছে। এ-কারণেই কারাগারে প্রেরণের ঘটনা সেই রমণীদের ঘটনার পরে ঘটেছিলো। দ্বিতীয় কারণ এই যে, হযরত ইউসুফ আ. মনে করতেন, আযিযে মিসর আমার সঙ্গে যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করেছেন, আমাকে সম্মান দিয়েছেন এবং মর্যাদা প্রদান করেছেন। সুতরাং এটা সঙ্গত নয়, আমি তাঁর স্ত্রীর নাম উল্লেখ করে তাঁর অপমান ও দুর্নামের কারণ ঘটাই।

মোটকথা, বাদশাহ ইউসুফ আ.-এর কথা শুনে সেই রমণীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্য ও পরিষ্কারভাবে বলো, তোমরা যে ইউসুফকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিলে সে বিষয়টির প্রকৃত তথ্য কী? তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠলো—

حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ

'অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য, (আল্লাহ না করুন) আমরা তার মধ্যে কোনো দোষ (অসৎ প্রবৃত্তি) দেখি নি।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫১]

নারীদের এই সমাবেশে আযিযে মিসরের স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন আর প্রেমের আগুনে কাঁচা ছিলেন না; পাকা হয়ে উজ্জ্বল স্বর্ণে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি অপমান ও দুর্নামের ভয়কে অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, হযরত ইউসুফ আ.-এর আকাঙ্ক্ষা হলো সত্য ও প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়ে পড়ুক, তখন তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবেই বলে উঠলেন—

الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

'এখন সত্য প্রকাশিত হলো, আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, (কেননা, আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম)। সে তো (তার বর্ণনায়) সত্যবাদী।'

[সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫১]

আযিযে মিসরের স্ত্রী আরো বললেন—

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ () وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة يوسف)

'তা (আমি বললাম,) এইজন্য যে, যাতে সে (ইউসুফ) জানতে পারে আমি তার অগোচরে (অনুপস্থিতিতে) তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি এবং (এজন্যও, যাতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে,) নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। (তাদের সামনে কখনো সফলতার পথ খুলে দেন না।)' সে বললো, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না; (নিজের নফসের পবিত্রতা দাবি করি না।) মানুষের নফস (মন) অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ, (মন্দ কাজের প্রতি বড়ই প্ররোচনা দানকারী) কিন্তু সে নয়, (তার ক্ষেত্রে নফসের প্ররোচনা ফলপ্রদ হয় না) যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫২-৫৩]

আমি (মূল গ্রন্থকার) বিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসি রহ. কর্তৃক রচিত 'তাফসিরুল বাহরিল মুহিত'-এর তরজমা অনুযায়ী এই আয়াতদুটির অনুবাদ করেছি। অন্য মুফাস্‌সিরগণ ভিন্নরূপে তাফসির করে থাকেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং তাঁর শাগরিদ ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. তাঁদের তাফসিরে এই আয়াতদুটির অনুবাদ করেছেন এভাবে—

'তা (আমি বললাম,) এইজন্য যে, যাতে সে (আযিযে মিসর) জানতে পারে আমি[১৫] তার অগোচরে (অনুপস্থিতিতে) তার প্রতি (এর চেয়ে বেশি আর) কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করি নি (যার অবস্থা সে নিজেও জানে) এবং নিশ্চয়

---

[১৫] অধিকাংশ তাফসিরকারের মতে ৫২ ও ৫৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো হযরত ইউসুফের উক্তি।

আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। (সুতরাং, আমি যদি এর চেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করতাম তাহলে তা প্রকাশ হয়ে পড়তো।)' সে বললো, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না; মানুষের নফস (মন) অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, (সেই ব্যক্তির প্রতি নফসের প্ররোচনা কাযকরী হয় না) যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

অর্থাৎ তাঁরা দুজনই (আবু হাইয়ান আন্দালুসির মতো) এই বাক্যদুটিকে আযিযে মিসরের স্ত্রীর উক্তি সাব্যস্ত করেন, তবে তাঁরা لَمْ أَخُنْهُ শব্দের ہ সর্বনামটির লক্ষ্যস্থল (ইউসুফকে না করে) আযিযে মিসরকে সাব্যস্ত করেন।

আর সাধারণ মুফাস্সিরগণ এই পূর্ণ উক্তিকে হযরত ইউসুফ আ.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেন এবং لَمْ أَخُنْهُ শব্দের ہ সর্বনামটির লক্ষ্যস্থল আযিযে মিসরকে সাব্যস্ত করেন, যেভাবে ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং ইবনে কাসির রহ. সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা আয়াতদুটির তরজমা করেন এভাবে—

'ইউসুফ বলেন, 'তা (আমি বললাম,) এইজন্য যে, যাতে সে (আযিযে মিসর) জানতে পারে আমি তার অগোচরে (অনুপস্থিতিতে) তার প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করি নি (তার আমানতে খেয়ানত করি নি) এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।' সে (ইউসুফ) বললো, 'আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না; (আমার নফসকে পাক বলি না) মানুষের নফস (মন) অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ, (মন্দের প্রতি প্ররোচিত করে) কিন্তু সে নয়, (সেই ব্যক্তির প্রতি নফসের প্ররোচনা কাযকরী হয় না) যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। (নফসের প্ররোচনা সেখানে সফল হয় না) আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

এই মুফাস্সিরগণ 'আমি আমার নফসকে পবিত্র বলি না বা নির্দোষ মনে করি না' সম্পর্কে বলেন, হযরত ইউসুফ আ. এ-ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের নফসের পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। আর একজন উচ্চ মর্যাদাশীল নবী এবং আল্লাহপাকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে এটা প্রকাশ করে দেয়া জরুরি ছিলো যে, আমার পবিত্রতা ও নিষ্পাপতার বিষয়টি আমার নফসের বদৌলতে নয়; বরং আমার পবিত্রতা শুধু আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহের দান এবং আল্লাহর রহমতই নবীগণের নিষ্পাপতার যিম্মাদার।

যাইহোক। হযরত ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতা, নিষ্পাপতা ও সততার ব্যাপারটি অপবাদ প্রদানকারিণীদের নিজেরদের মুখ থেকেই উচ্চারিত হওয়ার সময় এসে গিয়েছিলো। সুতরাং তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে গেলো এবং বাদশাহর দরবারে অপরাধীরা অপরাধ স্বীকার করে বললো যে, ইউসুফ আ. সকল প্রকার আবিলতা ও কলুষতা থেকে পবিত্র।

সূক্ষ্মতত্ত্ব

ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ আর-রাযি রহ. বলেন, হযরত ইউসুফ আ. আল্লাহ তাআলার সত্য পয়গাম্বর এবং নিষ্পাপ নবী ছিলেন। সুতরাং তিনি সব ধরনের মলিনতা থেকে পবিত্র ছিলেন। তাঁর পবিত্র জীবনের একটি একটি মুহূর্তকেও কোনো প্রকারের অপবিত্রতা স্পর্শ করতে পারে নি। আল্লাহ তাআলার অদ্ভুত মহিমা লক্ষ করুন, ইউসুফ আ.-এর ঘটনার সঙ্গে যতগুলো মানুষ জড়িত তাদের সবার মুখ থেকে হযরত ইউসুফ আ.-এর সত্তার পবিত্রতা ও নির্দোষিতা স্বীকার করিয়ে নিলেন। প্রবাদ আছে—

الفضل ما شهدت به الأعداء

'উত্তম বিষয় তা-ই যা শত্রুর মুখে প্রকাশ পায়।'

আচ্ছা, হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনার সঙ্গে জড়িত লোক কারা? তাঁরা হলেন, আযিযে মিসর, আযিযে মিসরের স্ত্রী, শহরের নিমন্ত্রিত রমণীগণ, আযিযে মিসরের স্ত্রীর আত্মীয়—এই কয়জন মানুষই কোনো-না-কোনোভাবে অনুসন্ধান ও তদন্তসাপেক্ষে বিষয়টির সঙ্গে জড়িত। এঁদের মধ্যে প্রথমে দৃষ্টিপথে পড়ে যান আযিযে মিসরের স্ত্রীর আত্মীয়। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞের মতো জামা ছিন্ন হওয়ার বিষয়টির মীমংসা দিয়ে হযরত ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতা প্রকাশ করেন এবং স্ত্রীলোকটিকে অবপরাধী সাব্যস্ত করেন। তারপর প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার পর আযিযও স্বীকার করেন যে, ইউসুফ নিষ্পাপ, নির্দোষ ও পবিত্র। তা ছাড়া তিনি يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا 'ইউসুফ, তুমি বিষয়টি ক্ষমা করো বা উপেক্ষা করো' বলে ওজরও পেশ করেন এবং নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য এখানেই ব্যাপারটি সমাপ্ত করার আবেদন জানান। তৃতীয় সারিতে আছেন শহরের নিমন্ত্রিত রমণীগণ। বাদশাহ যখন জনাকীর্ণ

দরবারে হযরত ইউসুফের ব্যাপারে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তাঁরা নির্দ্বিধায় বলে উঠলেন—

حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ

'অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য, আমরা তার মধ্যে কোনো দোষ দেখি নি। (আল্লাহ না করুন, আমরা ইউসুফ থেকে কোনো অসৎ প্রবৃত্তি দেখি নি।)' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫১]

এভাবে আল্লাহপাক হযরত ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতার ওপর সীলমোহর মেরে দিলেন। এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণ হযরত ইউসুফ আ.-এর আত্মীয় স্বজন ও পক্ষসমর্থক লোকদের মাধ্যমে ছিলো না; বরং অপরিচিত আযিযে মিসরের স্ত্রীর গোত্র ও বংশের লোকদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিলো। তারপরও এ-ধারণা বা সন্দেহের উদ্রেক হতে পারতো যে, এ-ঘটনায় ইউসুফ আ.-এর অবশ্যই কিছু-না-কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিরাট দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো এই যে, তিনি নিজের পবিত্র বান্দার পবিত্রতা ঘোষণা এবং সে-সম্পর্কে খারাপ ধারণার নাম পর্যন্ত মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে জনাকীর্ণ সমাবেশের সামনে স্বয়ং অপরাধীর দ্বারা অপরাধ স্বীকার করিয়ে দিলেন। তাঁরই মুখে হযরত ইউসুফের সততা ও পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়ে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দিলেন। বাদশাহর দরবারে আযিযে মিসরের স্ত্রী এ-কথা বলতে বাধ্য হলেন যে—

الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

'এখন সত্য প্রকাশিত হলো, আমিই তাকে (তার নিজের ব্যাপারে) ফুসলিয়েছিলাম, (এবং কোনো সন্দেহ নেই যে,) সে তো সত্যবাদী।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫১]

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (سورة الجمعة)

'তা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন এবং আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।' [সুরা জুমআ : আয়াত ৪]

বাদশাহ ফেরআউন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারার পর তাঁর অন্তরে হযরত ইউসুফ আ.-এর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেলো। ভালো ধারণার সঙ্গে শরাব পরিবেশনকারী কর্তৃক ইউসুফ আ.-এর জ্ঞান-বুদ্ধির উল্লেখ করা, বাদশাহর স্বপ্নের উত্তম ও মনঃপূত ব্যাখ্যা, তাঁর সত্তার পবিত্রতা

এভাবে ঘোষিত হওয়া ইত্যাদি বিষয় একত্র হয়ে এই উচ্চ মর্যাদাবান ও মহান ব্যক্তিত্বের দর্শনলাভ এবং তাঁর থেকে উপকার লাভের জন্য বাদশাহকে আশিক বানিয়ে দিলো। তিনি বললেন—

ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

'তাকে (ইউসুফকে অবিলম্বে) আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে বিশেষ করে আমার কাজের জন্য নিযুক্ত করবো। (আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো।)'

হযরত ইউসুফ আ.-এর বুদ্ধিমত্তা ও আত্মমর্যাদাবোধ, নির্দোষিতা ও পবিত্রতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে বাদশাহর দরবারে আগমন করলেন। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের পর বাদশাহ হতবাক হয়ে থাকলেন। এ-যাবৎ তিনি যাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও প্রতিজ্ঞাপালন ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, এখন দেখলেন যে সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণাতায় অতুলনীয়। বাদশাহ্ সানন্দে বললেন—

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

'আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, বিশ্বাসভাজন হলে।'

এরপর বাদশাহ ইউসুফ আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্বপ্নের মধ্যে যে-দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে-ব্যাপারে আমাকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

'ইউসুফ বললো, 'আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন[১৬]; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ। (আমাকে রাজ্যের পুরো ধনভাণ্ডারের অধিকারী বানিয়ে দিন। আমি রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এই কাজে বিশেষজ্ঞ।)' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫৫]

বাদশাহ তা-ই করলেন। ইউসুফ আ.-কে গোটা রাজ্যের আমানতদার ও তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দিলেন এবং রাজ্যের ক্ষমতার অধিকারী করে দিলেন। তাওরাতে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

---

[১৬] হযরত ইউসুফ আ. আসন্ন দুর্ভিক্ষে ন্যায়নীতির মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করার জন্য এই পদ চেয়েছিলেন।

'হযরত ইউসুফ আ.-এর এই স্বপ্নফল বর্ণনা ফেরআউন ও তাঁর সব কর্মচারীর দৃষ্টিতে উত্তম বলে বিবেচিত হলো। ফেরআউন তাঁর কর্মচারীদেরকে বললেন, আমরা কি এই ব্যক্তির মতো একজন মানুষকে, যার ভেতরে সৃষ্টিকর্তার আত্মা রয়েছে, পেতে পারি? ফেরআউন ইউসুফ আ.-কে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং এখানে কেউই তোমার মতো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী নয়। সুতরাং তুমি আমার রাজ্যের ওপর স্বাধীন ক্ষমতাবান হলে। আমার প্রজাবৃন্দের ওপর তুমি তোমার আদেশ জারি করো। শুধু সিংহাসনে আমি তোমার উর্ধ্বে থাকবো। এরপর ফেরআউন ইউসুফ আ.-কে বললেন, দেখো, আমি তোমাকে সমগ্র মিসর রাজ্যের ওপর শাসনক্ষমতা দান করলাম। ফেরআউন তাঁর হাত থেকে রাজকীয় আংটি খুলে ইউসুফ আ.-এর হাতে পরিয়ে দিলেন। তাঁকে কাথানের পোশাক পরালেন। তাঁর গলায় পরালেন স্বর্ণের মালা। ফেরআউন তাঁকে সমগ্র মিসর রাজ্যের শাসক নিযুক্ত করলেন। এরপর ফেরআউন হযরত ইউসুফ আ.-কে বললেন, আমি ফেরআউন এবং তুমি ছাড়া গোটা মিসর রাজ্যের আর কোনো মানুষই হাত-পা নাড়বে না।'[১৭]

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং দয়া ও অনুগ্রহের একি বিচিত্র লীলা! গতকাল যে-ব্যক্তিকে মিসরের সভ্য জাতি যাযাবর ও মরুবাসী বলে বিশ্বাস করতো, যিনি বিদুইন ছিলেন, ক্রীতদাসও ছিলেন, তাঁকে প্রথমে একজন নেতৃস্থানীয় আমির লোকের ঘরের সরদার, ঘরের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর স্বাধীন ক্ষমতাবান এবং আমিরের দৃষ্টিতে সম্মানিত, জ্ঞানী ও বিশ্বাসভাজন বানানো হলো। আবার যখন আল্লাহপাক তাঁকে কারাগারের দুর্দশাময় জীবন থেকে বের করে আনলেন, সঙ্গে সঙ্গেই মিসর রাজ্য ও মিসরের জনগণের স্বাধীন ক্ষমতাবান শাসক বানিয়ে দিলেন। এভাবে তাঁকে এমন পর্যায়ে পৌছিয়ে দিলেন, পার্থিব কারণ ও উপকরণের অধীন থেকে এমনটা কল্পনাও করা যায় না। এটা অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআলার অলৌকিক কার্যাবলির প্রকাশ ছাড়া আর কী হতে পারে? কেননা, যিনি গতকাল কিনআনে বকরি চরাতেন, তিনি আজ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সভ্য জাতির শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে রাজ্য পরিচালনা করছেন। এটা সত্য কথা

---

[১৭] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪১, আয়াত ৩৭-৪৪।

যে, আল্লাহর দরবারে যিনি সম্মান ও প্রিয়পাত্র হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর জন্য পথের যাবতীয় কষ্ট ও বাধাবিঘ্ন খুবই তুচ্ছ এবং অবস্থার প্রতিকূলতা তৃণের তুল্যও নয়।

এ-কারণে আল্লাহ তাআলা আযিযে মিসরের কাজ-কারবারের স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে ইউসুফের উদ্দেশে বলে দিয়েছিলেন, আমি ইউসুফকে জমিনের ওপর ক্ষমতা প্রদান করলাম। এখন সেই শুরুরই যখন এই পরিণতির প্রকাশ ঘটলো, আল্লাহপাক পুনরায় বললেন—

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ () وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (سورة يوسف)

'এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে (মিসরে) প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে সেই দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। যারা মুমিন ও মুত্তাকি (আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং মন্দ কাজ থেকে পবিত্র থেকেছে) তাদের আখেরাতের পুরস্কারই (দুনিয়ার পুরস্কারের চেয়ে বহুগুণে) উত্তম।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫৫-৫৬]

সুরা ইউসুফরে দুই জায়গায় হযরত ইউসুফ আ.-এর জন্য 'জমিনের ওপর মালিক বানিয়ে দেয়া'র সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং উভয় স্থানের বর্ণনায় নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর তাফসিরগ্রন্থ 'তরজুমানুল কুরআনে' লিখেছেন :

> 'হযরত ইউসুফ আ.-এর মিসরীয় জীবনে দুটি বিপ্লবাত্মক ধাপ ছিলো। একটি এই যে, তিনি ক্রীতদাসরূপে মিসরের বাজারে বিক্রিত হলেন। এরপর তিনি প্রভু আযিযে মিসরের দৃষ্টিতে এমন সম্মানিত হলেন যে, তাঁর অধীন অঞ্চলের স্বাধীন ক্ষমতাবান হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় ধাপটি হলো, তিনি কারাগার থেকে বের হলেন এবং বের হয়েই এমন স্তরে পৌঁছে গেলেন, রাজ্য শাসনের সম্মানিত আসনে দীপ্তিমান হয়ে দৃষ্ট হতে লাগলেন। সুতরাং, যখন বিপ্লবের প্রথম ধাপ পর্যন্ত বিবরণ পৌঁছে গেলো তখন ২১ সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর হেকমতের মহিমার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন—

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

'এবং এইভাবে আমি ইউসুফকে জমিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম।'

আর এখন যখন দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটলো, ঠিক সেভাবেই ৫৬ সংখ্যক আয়াতে বললেন—

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

'এবং এইভাবে আমি ইউসুফকে জমিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম।'

প্রথম বিপ্লবে মিসর-সংক্রান্ত বিষয়টি সবেমাত্র শুরু হয়েছিলো। তখনো হযরত ইউসুফ আ.-এর রাজ্য পরিচালনার জ্ঞান হয় নি। এ-কারণে আল্লাহপাক ওখানে বলেছিলেন—

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ

'যেনো আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিই। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত।'

আর এখানে যেহেতু কার্য সম্পন্ন করার পর তার ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো, তাই আল্লাহপাক বলেছেন, وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 'আমি সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল বিনষ্ট করি না।'

এটা এইজন্য হলো যে, আল্লাহর বিধান—নেককাজের বীজ কখনো নষ্ট হয় না। তা অবশ্যই ফল আনয়ন করে।[১৮]

ঘটনার শুরুতে এ-কথা বলা হয়েছে যে, সুরা ইউসুফ ইহুদিদের একটি প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। মক্কার কাফেরদের মাধ্যমে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই প্রশ্নটি করেছিলো : হযরত ইবরাহিম আ.-এর বংশধরগণ মিসরে কীভাবে এলো? এ-কারণে আলোচ্য আয়াতটির তাফসিরে শাহ আবদুল কাদির সাহেব রহ. বলেন, তাদের প্রশ্নের জবাব এই : ইবরাহিম আ.-এর বংশধরগণ শাম থেকে মিসরে এলো এভাবে যে, হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা হযরত ইউসুফকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো যেনো তিনি লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হন। ইউসুফ আ. মিসরে এলে আল্লাহপাক তাঁকে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দান করেন। তাঁকে মিসর

---

[১৮] তরজুমানুল কুরআন : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৫, (নোট)।

সাম্রাজ্যের ওপর স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করেন। ঠিক এমন হয়েছে আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষেত্রে।[১৯]

মোটকথা, হযরত ইউসুফ আ. মিসরের পূর্ণ শাসনক্ষমতা লাভ করে বাদশাহর স্বপ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুরু করে দিলেন। এসব ব্যবস্থা চৌদ্দ বছরের মধ্যে কাজে লাগতে পারে এবং রাজ্যের প্রজাবৃন্দ দুর্ভিক্ষের সময়ও ক্ষুধা ও দুর্দশা থেকে রক্ষা পেতে পারে। যেহেতু স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে সেসব ব্যবস্থার কথা আপনা আপনিই বুঝা যায়, তাই পবিত্র কুরআন ঘটনার অপ্রয়োজনীয় অংশগুলোকে বর্ণনা করে নি। অবশ্য তাওরাত সেসব বিস্তারিত বিবরণও বর্ণনা করেছে।

'আর ইউসুফ আ. যখন মিসরের বাদশাহ ফেরআউনের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো তিরিশ বছর। ফেরআউনের দরবার থেকে বের হয়ে হযরত ইউসুফ আ. গোটা মিসর দেশে ভ্রমণ করলেন। আর সাত বছরে যখন জমিন ফসলে পরিপূর্ণ হলো, তিনি সারাদেশের সমস্ত বাড়তি খাদ্যশস্য দেশের জনপদে জনপদে সংগ্রহ করে রাখলেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জনপদের পাশের খেতগুলোর শস্য সেই জনপদেই রেখে দিলেন। মোটকথা, হযরত ইউসুফ আ. নদীর অগণিত বালুকারাশির মতো এক অধিক পরিমাণে শস্য সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে রাখলেন যে, তার পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। অবশেষে মিসর দেশে চলমান সস্তা ও সচ্ছলতার সাত বছর শেষ হয়ে গেলো এবং দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর—যেমন হযরত ইউসুফ আ. বলেছিলেন—শুরু হয়ে গেলো। গোটা দেশে অভাব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কিন্তু তখনো মিসরে ঘরে ঘরে খাদ্যদ্রব্য ছিলো। এরপর যখন গোটা মিসর দেশে মানুষ অনাহারে ধ্বংস হতে লাগলো, প্রজাবৃন্দ খাদ্যের জন্য ফেরআউনের দরবারে এসে উপস্থিত হলো এবং খাদ্যের জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলো। ফেরআউন মিসরবাসীকে বললেন, তোমরা ইউসুফের কাছে যাও। সে যা বলে তোমরা তা-ই করো। যখন সারাদেশে আকাল-অনাহার ছড়িয়ে পড়লো, হযরত ইউসুফ আ. যাবতীয় সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খুলে দিলেন এবং মিসরবাসীদের কাছে বিক্রয় করতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষ ভীষণ আকার ধারণ করলো। আশপাশের

মুওয়াদ্দিহুল কুরআন : সুরা ইউসুফ।

দেশগুলোও খাদ্য ক্রয়ের জন্য মিসরে আসতে লাগলো। কেননা, সব দেশেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিলো।

হযরত ইয়াকুব আ. দেখলেন, মিসরে খাদ্য-শস্য মওজুদ আছে। তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, তোমরা একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছো কেনো? দেখো, আমি শুনেছি যে, মিসরে খাদ্য-শস্য আছে। তোমরা মিসরে গিয়ে আমাদের জন্য খাদ্য-শস্য ক্রয় করে আনো। তাহলে আমরা আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারবো, মরবো না।’[২০]

সারকথা, দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব যখন ঘটলো, তখন মিসর ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। কিনআনে হযরত ইয়াকুব আ.-এর বংশও এই দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেলো না। অবস্থা যখন অত্যন্ত করুণ হয়ে দাঁড়ালো, হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, মিসরে আযিযে মিসর ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে খাদ্যশস্য মওজুদ আছে। তোমরা সবাই যাও এবং খাদ্যশস্য কিনে আনো। পিতার আদেশ অনুযায়ী ইয়াকুব আ.-এর পুত্রগণসহ কিনআনের একটি কাফেলা আযিযে মিসরের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে আনার জন্য মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা করলো।

আল্লাহ তাআলার মহিমা দেখুন, হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইদের কাফেলা তাঁদের সেই ভাইয়ের কাছ থেকেই খাদ্যশস্য আনার জন্য যাত্রা করলেন, যাঁকে তাঁরা নিজেদের ধারণায় মিসরেরই কোনো এক মিসরীয় পরিবারের সাধারণ ও অপরিচিত ক্রীতদাস বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইউসুফকে বিক্রি করে দেয়া ওই কাফেলা কি জানতো, গতকালের সেই ক্রীতদাস আজ মিসরের রাজমুকুট ও সিংহাসনের মালিক এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী? এবং তাঁরা আজ তাঁরই কাছে নিজেদের দুরবস্থার কথা নিবেদন করতে যাচ্ছেন।

যাইহোক। তাঁরা কিনআন থেকে রওয়ানা দিয়ে মিসরে পৌছলেন। যখন তাঁদেরকে ইউসুফ আ.-এর দরবারে উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি ভাইদেরকে চিনতে পারলেন। কেনো চিনবেন না? তাঁদের ভাব-ভঙ্গি, কথা-

[২০] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪১, আয়াত ৪৬-৪৯ এবং অনুচ্ছেদ ৪২, আয়াত ১-২।

বার্তা, স্বর ও সুর, আকার-আকৃতি এবং সব ধরনের গতিবিধি ইউসুফ আ.-এর পরিচিত ছিলো। অবশ্য তাঁরা হযরত ইউসুফ আ.-কে চিনতে পারলেন না। কেমন করে চিনবেন? সেদিন যিনি ছিলেন ছোট শিশু, আজ তিনি প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন অভিজ্ঞ লোক। আকার-আকৃতি, বর্ণ, কথা-বার্তায় কোনো সন্দেহও কেমন করে করবেন? তাঁদের ধারণায় এবং কল্পনায়ও এটা আসতে পারে নি যে, ইনি ইউসুফ আর এই তাঁর সিংহাসন। কিন্তু এটাই ছিলো বাস্তব ঘটনা ও প্রকৃত ব্যাপার। এটা ছিলো নিজের মনোনীত বান্দার সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সেই ঘটনা, যা ভূ-পৃষ্ঠের ওপর ঘটেই গিয়েছিলো।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে—

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (سورة يوسف)

'আর (এরপর ব্যাপার এই ঘটলো যে,) ইউসুফের ভাইয়েরা (খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য মিসরে) এলো এবং তারা তাঁর কাছে (ইউসুফের দরবারে) উপস্থিত হলো। ইউসুফ তাদেরকে চিনতে পারলো; কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারলো না।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫৮]

তাওরাত বলছে : হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইদের প্রতি গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁদেরকে ইউসুফ আ.-এর সামনে উপস্থিত করা হলো এবং এভাবে তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনার সুযোগ হলো। হযরত ইউসুফ আ. তাঁদেরকে পিতা, সহোদর ভাই এবং বাড়ির যাবতীয় অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞেস করলেন এবং একের পর এক সবকিছু জেনে নিলেন। এরপর তাদেরকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ভরপুর খাদ্যশস্য দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে এটাও বলে দিলেন যে, দুর্ভিক্ষ এতটাই ভয়ঙ্কর যে, তোমাদেরকে আবারো এখানে আসতে হবে। সুতরাং স্মরণ রেখো, আগামীবার যদি তোমরা তোমাদের ছোটভাই বিনইয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে না আসো, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জানিয়েছো যে, তার ভাই ইউসুফ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে এবং সে-কারণে তাদের পিতা কোনোক্রমেই তাকে কাছছাড়া করছেন না, তবে তোমরা আর কখনো খাদ্যশস্য পাবে না।

পবিত্র কুরআন এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ () فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (سورة يوسف)

'এবং সে যখন তাদেরকে সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো তখন সে তাদেরকে বললো, 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাই (বিনইয়ামিন)-কেও নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছো না যে, আমি মাপে (খাদ্যশস্য) পূর্ণমাত্রায় দিই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ (বহিরাগতদের যথেষ্ট সেবা ও যত্ন করে থাকি)। কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আসো তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ[২১] থাকবে না (তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো ক্রয়-বিক্রয় হবে না) এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না[২২] (তোমরা আমার কাছে কোনো স্থানও পাবে না)।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৬৯-৬০]

হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা বললেন, আমরা আমাদের পিতার কাছে বলবো এবং সব দিক থেকে তাঁকে উৎসাহ প্রদান করবো। যেনো তিনি বিনইয়ামিনকে আমাদের সঙ্গে এখানে পাঠাতে সম্মত হন। এরপর যখন তাঁরা প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন, ইউসুফ আ. তাঁদের থেকে বিদায় গ্রহণ করতে এলেন, ইত্যবসরে তিনি তাঁর চাকর-বাকরদের নির্দেশ দিলেন, তাঁদের মূলধন, যা তারা খাদ্যশস্যের মূল্যস্বরূপ দিয়েছিলো, গোপনে তাদের উটের হাওদার মধ্যে রেখে দাও। তাহলে বাড়ি গিয়ে যখন তারা তা দেখতে পাবে, এটা বিচিত্র নয় যে, তারা আবার ফিরে আসবে। এই কাফেলা কিনআনে পৌছার পর তাঁরা তাঁদের পিতাকে সম্পূর্ণ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করে শুনালেন। তাঁরা বললেন, মিসরের শাসনকর্তা আমাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, যতক্ষণ নিজেদের বৈমাত্রেয় ভাই বিনইয়ামিনকে সঙ্গে না আনবে, ততক্ষণ তোমরা এখানে এসো না এবং খাদ্যশস্য ক্রয়ের কল্পনাও করো না। সুতরাং, আপনার উচিত হবে বিনইয়ামিনকে আমাদের

---

[২১] এখানে كَيْل শব্দ দ্বারা যা মেপে নেয়া হয় তা অর্থাৎ বরাদ্দ রসদ বুঝাচ্ছে।

[২২] তাকে না আনলে বুঝা যাবে তোমাদের তেমন কোনো ভাই নেই। তোমরা মিথ্যা বলে তার নামে বরাদ্দ চাচ্ছো।

সঙ্গী করে দেয়া। আমরা সব দিক থেকে তার সংরক্ষক ও হেফাজতকারী রয়েছি।

হযরত ইয়াকুব আ. বললেন, আমি তার ব্যাপারে তেমনই ভরসা করবো, যেমন ভরসা তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? আর তোমাদের হেফাজত ও সংরক্ষণ কী? আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম হেফাজতকারী, তাঁর চেয়ে বড় দয়ালুও আর কেউ নেই। এই মর্মে পবিত্র কুরআন বলছে—

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (سورة يوسف)

'সে (ইয়াকুব) বললো, 'আমি কি তোমাদেরকে তার (বিনইয়ামিনের) সম্পর্কে তেমন বিশ্বাস (নির্ভর) করবো যেমন বিশ্বাস (নির্ভর) ইতোপূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম তার ভাই (ইউসুফ) সম্পর্কে? আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৬৪]

এই কথোপকথন শেষে ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাঁদের আসবাবপত্র খুলতে শুরু করলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, তাঁদের মূলধন তাঁদেরকেই ফেরত দেয়া হয়েছে। এই কাণ্ড দেখে তাঁরা বলতে লাগলেন, হে আমাদের পিতা, এর চেয়ে অধিক আমরা আর কী চাই? খাদ্যশস্যও পাওয়া গেছে আর আমার মূলধন যেমন ছিলো তেমনই ফেরত দেয়া হয়েছে। তিনি তো আমাদের কাছ থেকে খাদ্যশস্যের মূল্যও গ্রহণ করেন নি! এখন আমাদেরকে অনুমতি দিন, পুনরায় আমরা তাঁর কাছে যাবো এবং আমাদের পরিবারবর্গের জন্য সামগ্রী নিয়ে আসবো। বিনইয়ামিনকেও আমাদের সঙ্গে দিন, আমরা তার পূর্ণ হেফাজত করবো। ফলে আরো অতিরিক্ত এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য নিয়ে আসবো। কেননা, আমরা আগেরবার যে-খাদ্যশস্য এনেছি তা সামান্য।

আর তাওরাতে[২৩] বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা এবং ইয়াকুব আ. তাঁদের মূলধন ফেরত দেয়া হয়েছে দেখে ভয় পেয়েছিলেন যে, না জানি এখন আবার নতুন কোনো বিপদ এসে পড়ে। কিন্তু ঘটনাবলির ধারাবাহিক সংঘটন এবং হযরত ইউসুফ আ.-এর

[২৩] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায় :

কর্মপদ্ধতির প্রেক্ষিতে, যার একই রকম বর্ণনা পবিত্র কুরআনে ও তাওরাতে রয়েছে, কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই সঠিক হবে। ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা নিজেদের হাতেই খাদ্যশস্যের মূল্য পরিশোধ করেছেন। আদান-প্রদানের পরেই তাঁদের কাফেলা দেশে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। তখন প্রত্যেক ভাইয়ের উটের হাওদার মধ্যে পৃথক পৃথক করে ওইভাবে মূল্য ফেরত দেয়া প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে এ-পথই নির্দেশ করে যে, মিসরের শাসক আমাদের মিসরে অবস্থানকালে যেভাবে আমাদের সমাদর ও সম্মান করেছেন, সে একইভাবে তিনি এই মূলধনও ফেরত দিয়েছেন। তিনি এই অনুগ্রহ ও কল্যাণকামিতার প্রতিদান প্রাপ্তির উদ্দেশে তা প্রকাশ করাও সঙ্গত মনে করেন নি।

যাইহোক। ইয়াকুব আ. বললেন, আমি বিনইয়ামিনকে কখনো তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো না, যে-পর্যন্ত না তোমরা আমার সঙ্গে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। তা এই যে, যে-পর্যন্ত আমরা অবরুদ্ধ না হই, সব দিক থেকে অপারগ না হই, আমরা অবশ্যই তাকে আপনার কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। ভাইয়েরা সবাই ঐকমত্যের সঙ্গে পিতার সামনে এভাবে পাকা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো এবং সার্বিক দিক থেকে পিতাকে নিশ্চিত করলো। তখন ইয়াকুব আ. বললেন, এসব যা-কিছু হলো তা কেবল বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করা-স্বরূপ। অন্যথায় তোমরাই কী? তোমাদের হেফাজতই কী? আমারই কী? আমাদের প্রতিজ্ঞাই কী? আমাদের সবারই এ-ব্যাপারটিকে আল্লাহ তাআলার যিম্মাদারিতে ছেড়ে দেয়া উচিত।

قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (سورة يوسف)

'ইয়াকুব আ. বললেন, 'আমরা যে-বিষয়ে কথা বলছি, (যা-কিছু কথাবার্তা বললাম ও প্রতিজ্ঞা করলাম) আল্লাহ তাআলাই তার বিধায়ক।' [সূরা ইউসুফ: আয়াত ৬৬]

পিতার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর ইউসুফ আ.-এর ভাইদের কাফেলা পুনরায় কিনআন থেকে মিসরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছেন। এবার তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বিনইয়ামিন। হযরত ইয়াকুব আ. তাঁদেরকে বিদায় দেয়ার সময় নসিহত করলেন, দেখো, তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে মিসরে প্রবেশ করো না; বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো। তাঁদেরকে এটাও বললেন, এই উপদেশের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তোমরা নিজেদের

ব্যবস্থায় আত্মনির্ভরশীলতার ধোঁকায় পতিত হও। কেননা, আমি তোমাদেরকে এমন কোনো বিষয় থেকে রক্ষা করতে পারবো না যা আল্লাহ তাআলার আদেশে হবে। নির্দেশ প্রদানের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করলাম এবং তাঁরই ওপর সমস্ত নির্ভরকারীর নির্ভর করা কর্তব্য। সুতরাং, যা-কিছু আমি বললাম, তা কেবল সতর্কতা অবলম্বনমূলক ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা এবং তাঁর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখার সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আল্লাহভক্তি ও তাকওয়ার বিরোধী নয়।

মুফাস্‌সির উলামায়ে কেরাম সাধারণভাবে হযরত ইয়াকুব আ.-এর এই উপদেশের কারণ বর্ণনা করেছেন এটা যে, আযিযে মিসর হযরত ইউসুফ আ. প্রথমবার তাঁদের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করেছিলেন। এখন এই কাফেলা ইউসুফ আ.-এর নিমন্ত্রণে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে মিসরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। কাজেই পরে এমন না হয়, মিসরীয়গণ তাঁদের প্রতি হিংসা পোষণ করেন এবং তা তাঁদের দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কোনো কোনো মুফাস্‌সির ও ইতিহাসবেত্তা ইয়াকুব আ.-এর উপদেশের ভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তাওরাতের বর্ণনা থেকে এ-কথা বুঝা যায় যে, প্রথমবার ইউসুফ আ.-এর ভাইদের প্রতি গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহ করা হয়েছিলো। ইউসুফ আ. এই দোষারোপ না করলেও মিসরের মানুষ অবশ্যই তাঁদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছিলো। ইয়াকুব আ. পুত্রদের মুখ থেকে সেসব বিষয় বিস্তারিতভাবে শুনেছেন। তাই তিনি মনে করলেন, যদি এগারোজন যুবক এমন জাঁকজমকের সঙ্গে একত্রে শহরে প্রবেশ করে, তবে পাছে এমন না হয় যে, আযিযে মিসরের কাছে পৌঁছার আগেই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ-কারণেই তিনি উপদেশ দিলেন, দলবদ্ধ হয়ে শহরে প্রবেশ করো না। ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে এক-একজন মুসাফিরের মতো প্রবেশ করো।

এখানে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই তত্ত্বের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, ইয়াকুব আ. প্রজ্ঞাবান ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এবং ইলম ও প্রজ্ঞার এই দৌলত আল্লাহপাকই তাঁকে দান করেছিলেন। তাই তিনি পুত্রদেরকে উপদেশবাণী শুনিয়ে দিলেন যা তাঁর চিন্তায় এসে

গিয়েছিলো। অন্যথায় তো পিতার নির্দেশ কার্যে পরিণত করার পরও, আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় যা নির্ধারণ করে দিয়েছিলো তার মোকাবিলায় এই সতর্কীকরণ কোনোই কাজে আসে নি। পবিত্র কুরআনে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে—

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورة يوسف)

'যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে তাদেরকে আদেশ করেছিলো সেভাবেই প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে (আল্লাহর অভিপ্রায়ের মোকাবিলায়) তা কোনো কাজে এলো না; ইয়াকুব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় (একটি খেয়াল) পূর্ণ করেছিলো এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিলো, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম (আমি তাকে ইলম দান করেছিলাম)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।' [সুরা ইউসুফ: আয়াত ৬৮]

সারকথা এই যে, ইয়াকুব আ. যা-কিছু করেছিলেন, নিজের ইলম অনুযায়ী তাঁর এমনটাই করা উচিত ছিলো। কেননা, ইলমের দৌলত আল্লাহপাকই তাঁকে দান করেছিলেন। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, সাবধানতামূলক ব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে কার্যকরীই হবে। যদি আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় তার বিপরীত বিষয়কে কল্যাণকর মনে করে, তবে তা-ই হয়ে থাকে এবং যাবতীয় তদবির বা ব্যবস্থা বিফল হয়ে যায়। যেমন : সামনে বর্ণিত ঘটনায় বিনইয়ামিনের সঙ্গে যা ঘটেছে তা এ-কথারই প্রমাণ। বিনইয়ামিনকে আবদ্ধ করে রাখা হলো এবং এই কল্যাণকামিতার প্রতি লক্ষ রেখে আবদ্ধ করে রাখা হলো যে, তার পরিণতি ইয়াকুব আ.-এর গোটা বংশের জন্য কল্যাণমণ্ডিত প্রমাণিত হবে।

ব্যাপার হলো এই, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা কিনআন থেকে যাত্রা করার পর পথিমধ্যে তাঁরা বিনইয়ামিনকে নানা ধরনের কষ্ট দিতে লাগলেন। কখনো তাঁকে পিতার অত্যধিক ভালোবাসার জন্য তিরস্কার করতো আবার কখনো এ-বিষয়ে হিংসা করতো যে, আযিযে মিসর বিশেষ করে তাঁকে কেনো ডাকলেন। বিনইয়ামিন তাঁর ভাইদের সব কথাই শুনতেন এবং

চুপচাপ থাকতেন। তাঁরা সবাই যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন, ইউসুফ আ. বিনইয়ামিনকে তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। তিনি বললেন, আমি তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ। তারপর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এখন আর ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাঁদের দুর্ব্যবহারের যুগ শেষে হয়ে গেছে। এখন তাঁরা তোমাদের আর কোনো ধরনের কষ্ট দিতে পারবেন না। পবিত্র কুরআনে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورة يوسف)

‘তারা যখন ইউসুফের সামনে উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ তাঁর সহোদরকে (বিনইয়ামিনকে) নিজের কাছে রাখলো (বসালেন) এবং (চুপি চুপি তাকে) বললো, ‘নিশ্চয় আমিই তোমার সহোদর (ভাই ইউসুফ), সুতরাং তারা যা করতো (যে-দুর্ব্যবহার তোমার সঙ্গে করতো) তার জন্য দুঃখ করো না।’ [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৬৯]

তাওরাতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ আ. ভাইদের খুবই সমাদর ও আদর-যত্ন করলেন। তিনি ভৃত্যদের নির্দেশ দিলেন, তাঁদের জন্য রাজকীয় অতিথিশালায় জায়গা করে দাও। ইউসুফ আ. তাঁদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ খাবারের আয়োজন করলেন। কয়েক দিন অবস্থানের পর যখন তাদের বিদায় গ্রহণের সময় হয়ে এলো, ইউসুফ আ. ভৃত্যদের নির্দেশ দিলেন, তাদের উটগুলোকে এই পরিমাণে বোঝাই করে দাও যতটুকু তারা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। হযরত ইউসুফ আ.-এর ইচ্ছা ছিলো যে, কোনোভাবে তাঁর প্রিয় ভাই বিনইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দেবেন। কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহ ও চরম অস্থিরতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে এমন করা সম্ভব হচ্ছিলো না। কারণ, মিসরের বিধান অনুসারে কোনো বহিরাগত ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত আটক করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিলো। হযরত ইউসুফ আ. কোনোভাবেই এটা চাইতেন না যে, সাধারণ মানুষের কাছে কিংবা তাঁর ভাইদের কাছে মূল রহস্য উন্মোচিত হয়ে পড়ুক। এ-কারণে তিনি নীরব থাকলেন। যখন কাফেলা যাত্রা শুরু করলো, কাউকে কিছু না জানিয়ে এক রুপার পেয়ালা চিহ্নস্বরূপ বিনইয়ামিনের হাওদার মধ্যে রেখে দিলেন।

কিনআনের এই কাফেলা মাত্র সামান্য পথই অতিক্রম করেছে, এ-সময় ইউসুফ আ.-এর কর্মচারীরা রাজকীয় বাসন-কোসনের তথ্যানুসন্ধান করে দেখলেন যে, ওখানে একটি রুপার পেয়ালা নেই। তারা ভাবলো, রাজমহলে কিনআনি কাফেলা ছাড়া আর কেউই আসে নি। সুতরাং এই পেয়ালা তারাই চুরি করেছে। তৎক্ষণাৎ তারা দৌড়ে গেলো এবং ডেকে বললো, হে কাফেলার লোকেরা, থামো, তোমরা চোর। ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা কর্মচারীদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমাদেরকে অযথা দোষারোপ করছো কেনো? আমাদেরকে তো এটা জানতে হবে যে তোমরা কী বস্তু হারিয়েছো। কর্মচারীরা বলতে লাগলো, বাদশাহর একটি রুপার পানপাত্র হারিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন (প্রধান কর্মচারী) অগ্রসর হয়ে বললো, যে-ব্যক্তির এই চুরির মালাটির সন্ধান দেবে সে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য পাবে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আমিই যিম্মাদার থাকলাম। ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা বললেন, আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী, তিনি সবকিছু জানেন, আমরা মিসরে ফাসাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশে আসি নি। তোমরা জানো, আমরা ইতোপূর্বেও খাদ্যশস্য নেয়ার জন্য এসেছিলাম। আমাদের মধ্যে চুরির অভ্যাস মোটেই নেই। কর্মচারীরা বললো, আচ্ছা, যার কাছে রুপার পানপাত্রটি পাওয়া যাবে তার কী শাস্তি হওয়া উচিত? তাঁরা জবাব দিলেন, সে নিজেই নিজের শাস্তি। আমরা তাকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করে দেবো, যেনো সে নিজের অপরাধের প্রতিফল হিসেবে বন্দি হয়। আমার আমাদের এ-জাতীয় অপরাধীকে এ-ধরনের শাস্তিই দিয়ে থাকি।

কর্মচারীরা তাঁদের কথা শুনে প্রথমে অন্য ভাইদের হাওদা ও বস্তাগুলোতে অনুসন্ধান করলো। যখন সেগুলোর মধ্যে পেয়ালাটি পাওয়া গেলো না, অবশেষে তারা বিনইয়ামিনের হাওদা ও বস্তা তল্লাশি করলো। বিনইয়ামিনের বস্তায় পেয়ালাটি পাওয়া গেলো। তারা পেয়ালাটি বের করে নিজেদের হাতে নিয়ে নিলো এবং কাফেলাকে শহরের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আযিযে মিসর হযরত ইউসুফ আ.-এর দরবারে বিষয়টি পেশ করলো। হযরত ইউসুফ আ. ঘটনাটির অবস্থা শুনে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার এই কাজে শোকর আদায় করলেন। তিনি ভাবলেন, যে-ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম, অর্থাৎ বিনইয়ামিন আমার কাছে থেকে যাক, তা আমার মাধ্যমে কোনোক্রমেই বাস্তব হয়ে ওঠে নি। আমার সেই উদ্দেশ্য

অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলা এই কৌশলের সঙ্গে পূর্ণ করে দিলেন। এই ভেবে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন। প্রকাশ করলেন না যে, এই পেয়ালা আমি নিজেই বিন ইয়ামিনের থলিতে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে দিয়েছিলাম। আর ওদিকে বিনইয়ামিনও ইতোপূর্বে তাঁর সম্মানিত ভাই ইউসুফ আ. সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। কাজে এই ঘটনা নিজের মনমতো ঘটেছে দেখে নীরব থাকলেন।

ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা যখন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁদের হিংসা-আক্রান্ত ধমনী নেচে উঠলো। হিংসায় ভর করে তাঁরা এই মিথ্যা কথা বলার দুঃসাহস করলেন যে, বিনইয়ামিন যদি এই পাত্র চুরি করে থাকে, তবে তা বিচিত্র ও বিস্ময়ের ব্যাপার কিছু নয়। কেননা, ইতোপূর্বে তার বড়ভাই ইউসুফও চুরি করেছিলো। হযরত ইউসুফ আ. ভাইদেরকে তাঁর মুখের ওপর মিথ্যা বলতে দেখেও কিছু বললেন না। ধৈর্যের সঙ্গে নীরব থাকলেন। রহস্য প্রকাশ করলেন না। মনে মনে বলতে লাগলেন, তোমাদের জন্য নিকৃষ্টতর অবস্থা এই যে, তোমরা এই ধরনের মিথ্যা দোষারোপ করছো। তোমরা যা-কিছু বলছো, আল্লাহ তাআলা তার প্রকৃত অবস্থা সম্যক অবগত আছেন। অথবা তাদেরকেই সম্বোধন করে বললেন, যেমন কোনো কোনো মুফাস্‌সির এমন ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ, ভাইদেরকে লজ্জিত করে বললেন, এইমাত্র তোমরা বলছিলে যে, তোমরা চুরির ধারে-কাছেও না। আর এখন তোমরা নিজের অনুপস্থিত ভাইয়ের ওপর চুরির দোষারোপ করছো। এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, চৌর্যবৃত্তি তোমাদের বংশেরই পেশা। এটা কেমন জঘন্য কাজ যা তোমরা করে যাচ্ছো।

কুরআনে ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে এভাবে—

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (سورة يوسف)

তারা ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা বললো, 'সে যদি চুরি করে থাকে তবে তার সহোদর ভাইও তো পূর্বে চুরি করেছিলো।'[২৪] কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত বিষয়টি

---

[২৪] হযরত ইউসুফ আ.-এর শৈশবের কোনো ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁরা পুনরায় তাঁকে দোষারোপ করছেন। প্রকৃতপক্ষে তা চুরির কোনো ঘটনা ছিলো না।

(তাঁর প্রতি অপবাদ) নিজের মনে গোপন রাখলো এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলো না; সে মনে মনে বললো, ' তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা-কিছু বলছো সে-ব্যাপারে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৭৭]

হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাঁর এমন মনোভাব দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা পিতার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের কথা মনে করলেন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন কী উপায়ে বিনইয়ামিনকে উদ্ধার করা যায়।আমরা তো প্রথম কথাতেই হেরে গেলাম। এখন শুধু একটি দিকই অবশিষ্ট আছে। তা হলো, বিনয় ও খোশামোদপূর্ণ আবেদন-নিবেদন ও কাতুতি-মিনতি করে বিনইয়ামিনকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আযিযে মিসরকে উদ্বুদ্ধ করা। তাঁরা বলতে শুরু করলেন, হে আযিযে মিসর, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি বিনইয়ামিনের বড় ভাইয়ের জন্য অত্যন্ত শোকগ্রস্ত এবং এ-কারণেই তিনি বিনইয়ামিনের জন্য ভালোবাসায় আত্মহারা ও প্রাগলপ্রায়। সুতরাং, এই বৃদ্ধের প্রতি দয়া করুন এবং বিনইয়ামিনের স্থালে আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রেখে দিন এবং তাকে শাস্তি প্রদান করুন। আপনি প্রথম থেকেই আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে আসছেন। নিশ্চয় আপনি অনুগ্রহশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আযিযে মিসর ইউসুফ আ. বললেন, আল্লাহপাকের আশ্রয় চাই। এটা কেমন করে সম্ভব? আমি এমন করি (বিনইয়ামিনের বদলে অন্যকাউকে রাখি), তাহলে তো অনাচারী হয়ে যাবো।

ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা এদিক থেকে নিরাশ হয়ে পড়লেন। তাঁরা ভিন্ন জায়গায় নির্জনে বসে পরামর্শ করতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠজন বললেন, তোমরা তো জানো যে, পিতা আমাদের থেকে বিনইয়ামিন সম্পর্কে কঠিন ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। আর ইতোপূর্বে তোমরা ইউসুফের প্রতি যে-জুলুম করেছো তাও সামনে রয়েছে। সুতরাং পিতা আমাকে কিনআনে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা অথবা আল্লাহপাক আমার জন্য কোনো উপায় করে দেয়ার আগ পর্যন্ত আমি এই জায়গা থেকে নড়বো না। যাও, তোমরা সবাই মিলে পিতার কাছে চলে যাও। তাঁর কাছে নিবেদন করো, আপনার পুত্র বিনইয়ামিন তো চুরি করেছে। আমরা যা জানতে পেরেছি তা-ই সত্য সত্য আপনার সামনে বর্ণনা করছি। আমাদের তো কোনো গায়বি ইলম ছিলো না যে আমরা আগে থেকেই জানতে পারতাম

তার দ্বারা এমন জঘন্য কাজ হবে। পিতাকে এটাও বলো, আপনি মিসরের লোকদের মাধ্যমে আমাদের কথার সত্যতা যাচাই করে নিন। তা ছাড়া আমরা যে-কাফেলার সঙ্গে মিসর থেকে কিনআনে এসেছি সেই কাফেলার লোকদের থেকেও জেনে নিন। তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমরা এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য বলছি।

এই পরামর্শ অনুযায়ী ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা কিনআনে ফিরে এলেন। তাঁরা কিছুমাত্র বেশকম না করে সম্পূর্ণ ঘটনা ইয়াকুব আ.-কে বর্ণনা করে শুনালেন। হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাঁদের পিতার সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে যে-কথোপকথন করেছেন তা পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে—

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ

'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বলো, 'হে আমাদের পিতা, আপনার পুত্র (বিনইয়ামিন) তো চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮১]

এই উক্তিটি উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন এ-কথা বলতে চায় যে, ইউসুফ আ.-এর বৈমাত্রেয় ভাইদের নির্মমতার মাত্রা অনুমান করুন—এমন করুণ সময়েও তাঁরা বৃদ্ধ পিতাকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও লজ্জা না দিয়ে ছাড়েন নি। তাঁরা এমন কথা বললেন না যে আমাদের ছোট ভাইটির দ্বারা এমন ত্রুটি ঘটে গেছে; বরং তাঁরা পিতার দিকেই সম্পর্ক আরোপ করে বললেন, আপনার পুত্র, হ্যাঁ আপনার একান্ত আদরের প্রিয় পুত্র চুরি করে আমাদের সবাইকে অপমানিত করেছে। আমরা কি জানতাম যে তার মধ্যে এই গুণটিও বিদ্যমান রয়েছে?

হযরত ইয়াকুব আ. আগে ইউসুফ আ.-এর ব্যাপারেই তাঁর পুত্রদের সত্যতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কাজেই তিনি তাঁদের কথা শুনে বললেন, না, তোমরা নিজেদের মন থেকে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছো। ঘটনা কখনো এমন ঘটে নি। বিনইয়ামিন এবং চুরি? এটা কখনো সম্ভব নয়। এখন ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এমন ধৈর্য যা উত্তম থেকে উত্তমতম। আল্লাহ তাআলার পক্ষে এটা বিচিত্র নয় যে তিনি একদিন এই হারানো পুত্রদেরকে পুনরায় একত্র করে দেবেন এবং একইসঙ্গে দুইপুত্রকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী,

প্রজ্ঞাময়। এই বলে তিনি তাঁর পুত্রদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বলতে লাগলে, আহ! ইউসুফের বিচ্ছেদজনিত শোক!

শোকের তীব্রতায় কাঁদতে কাঁদতে ইয়াকুব আ.-এর চোখ দুটি সাদা হয়ে গিয়েছিলো। শোকাগ্নির দহনে তাঁর হৃদয় জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর ওপর ভরসা করে অপেক্ষা করছিলেন।

ইয়াকুব আ.-এর পুত্ররা তাঁর এই অবস্থা দেখে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, আপনি ইউসুফের শোকে সবসময় এভাবে বিচলিত হতে থাকবেন অথবা এই শোকে আপনি শেষ পর্যন্ত জীবনই বিসর্জন দিয়ে দেবেন। হযরত ইয়াকুব আ. তাঁদের কথা শুনে বললেন, আমি তো তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করছি না, তোমাদেরকে বিরক্তও করছি না।

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورة يوسف)

'বরং আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ কেবল আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৬]

আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারানোর ঘটনাটির তাফসিরের ক্ষেত্রে সাধারণ তাফসিরসমূহ থেকে ভিন্ন, মুফাস্‌সিরগণের সেই ব্যাখ্যাটি অবলম্বন করেছি যা পরবর্তী যুগের মুফাস্‌সিরগণের কাছে দুর্লভ উক্তির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের তাফসিরই এখানে সবচেয়ে উত্তম ও নির্ভেজাল তাফসির। তাফসিরের কিতাবসমূহে সাধারণভাবে فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ['এরপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো, সে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে একটি পানপাত্রও রেখে দিলো।'] আয়াতে হযরত ইউসুফ আ.-এর এই কাজটির কারণ বর্ণনা করেছেন এটা যে, তিনি বিনইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু মিসরের আইন তা অনুমোদন করছিলো না। সুতরাং, এই মনে করে তিনি পানপাত্র রেখে দিয়েছিলেন যে, এভাবে বিনইয়ামিনকে চোর সাব্যস্ত করা যাবে। আর চুরি করার অপরাধের অজুহাতে আমি তাকে রেখে দিতে পারবো। এই মুফাস্‌সিরগণ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ [এরপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলো]

আয়াতে ইউসুফ আ.-কেই ঘোষণাকারী ব্যক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা বলছেন, ঘোষণাকারী হযরত ইউসুফ আ.-ই ছিলেন।

এভাবে তাঁদের পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি মিথ্যা রচনার দোষ আরোপ করা হচ্ছে। আবার তাঁরা একে অলঙ্কারশাস্ত্রের 'তাওরিয়াহ'[২৫] নামক বাক্‌পদ্ধতির আওতায় ফেলে তাঁর নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বকে এই মিথ্যা বলার দোষ থেকে পবিত্র করছেন। অথচ পবিত্র কুরআনে বর্ণনাপদ্ধতির মধ্যে এমন কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না যার মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আ.-এর ব্যক্তিত্বের ওপর মিথ্যার সন্দেহটুকু হতে পারে, অথবা তাঁর কথাকে 'তাওরিয়াহ' বলার প্রয়োজন হতে পারে।

এ-কথা মেনে নিলাম যে, কোনো প্রশংসনীয় ও ভালো উদ্দেশ্যে 'তাওরিয়াহ'র আশ্রয় গ্রহণ করা মন্দ ও নিন্দার্হ নয়। বরং ভালো। কিন্তু উপরিউক্ত মুফাস্‌সির একেবারেই ভুলে যাচ্ছেন, এটা আপনার-আমার কিংবা সাধারণ সৎ বান্দা ও পুণ্যবান মানুষের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসুলের ব্যাপার। তাঁদের চারিত্রিক জীবনের মানদণ্ড এ-ধরনের পারিভাষিক অভিব্যক্তির অনেক ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। তাঁরা তাঁদের জীবনের সৎ আকাঙ্ক্ষাগুলোর ক্ষেত্রেও দৃঢ় সংকল্পের উচ্চতাকে হাতছাড়া করেন না। তবে যেখানে পবিত্র কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি বাধ্য করে না এবং সহিহ হাদিসসমূহ তার সমর্থন করে না, সেখানে নবী-রাসুলের প্রতি এমন বিষয়ের সম্পর্ক আরোপ করার কী প্রয়োজন যা ঠিক রাখতে এবং নবীসুলভ নিষ্পাপতা করতে 'তাওরিয়াহ'র আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়?

এখানে পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ আ.-এর ব্যাপারে শুধু এইটুকু কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বাদশাহর পানপাত্র (একটি রুপার পাত্রকে) বিনইয়ামিনের মালপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন, (যেনো ভাইয়ের কাছে একটি স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান থাকে)। যেমন : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ

'এরপর সে (ইউসুফ) যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো, সে তার সহোদরের (বিনইয়ামিনের) মালপত্রের মধ্যে একটি পানপাত্রও রেখে দিলো।'

---

[২৫] تورية (তাওরিয়াহ) শব্দের অর্থ পরোক্ষ উল্লেখ, দ্ব্যর্থবোধক উক্তি।

এরপর হযরত ইউসুফ আ.-এর কোনো উল্লেখ নেই। বরং দেখা যাচ্ছে, যাবতীয় কথাবার্তা চলছিলো তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে। যেমন : পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে—

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ () قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ () قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ () قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ () قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ () قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (سورة يوسف)

'তারপর এক আহ্বায়ক চিৎকার করে বললো (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলো), হে যাত্রীদল[২৬], তোমরা নিশ্চয় চোর। ওরা (ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা) তাদের (ঘোষণাকারীদের) দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমরা কী হারিয়েছো?' তারা বললো, 'আমরা রাজার (ইউসুফের) পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা এনে দেবে সে এক উট বোঝাই মাল (খাদ্যশস্য) পাবে এবং আমি[২৭] তার জামিন (যিম্মাদার)।' ওরা বললো, 'আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জানো আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করতে আসি নি এবং আমরা চোরও নই। (মিসরে আমরা গোলমাল করতে আসি নি এবং কোনোকালে আমরা চোরও ছিলাম না।)' তারা বললো, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার[২৮] শাস্তি কী?' ওরা বললো, 'এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়[২৯]।' এইভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৭০-৭৫]

এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর এই বিষয়টি আইনগতভাবে আযিযে মিসরের [অর্থ হযরত ইউসুফ আ.-এর] দরবারে উপস্থাপিত হলো। ভাইদের

---

[২৬] العِيرُ শব্দের অর্থ : যেসব যাত্রী উট বা গাধার সাহায্যে যাত্রা করে; কিন্তু العِيرُ সাধারণভাবে যে-কোনো যাত্রীদলকেও বোঝায়।—আল-মানার।

[২৭] এখানে 'আমি' দ্বারা প্রধান আহ্বায়ক বা ঘোষণাকারীকে বুঝাচ্ছে।

[২৮] এখানে ه সর্বনাম দ্বারা যে চুরি করেছে তাকে বুঝানো হচ্ছে।

[২৯] সে-ই তার বিনিময়—অর্থাৎ দাসত্ব হবে তার শাস্তি।

তল্লাশি করা হলো এবং বিনইয়ামিনের মালপত্রের সঙ্গে সেই পাত্রটি পাওয়া গেলো। পবিত্র কুরআনে বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে—

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ

'এরপর সে তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশি করার পূর্বে তাদের (তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের) মালপত্র তল্লাশি করতে লাগলো। পরে তার সহোদরের (বিনইয়ামিনের) মালপত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বের করলো।' [সুরা ইউসুফ: আয়াত ৭৬]

এই বিবরণের পর আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলছেন, ইউসুফ যে-ব্যাপারটির জন্য অস্থির ছিলো এবং মিসরের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সে তা করতে পারছিলো না, আমি নিজের গোপন কৌশলের মাধ্যমে তার সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পবিত্র কুরআনে তা ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে—

كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (سورة يوسف)

'এভাবে আমি ইউসুফের (উদ্দেশ্য সফল হওয়ার) জন্য কৌশল করেছিলাম। রাজার আইনে সে তার সহোদরকে (বিনইয়ামিনকে) রেখে দিতে পারতো না, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপর আছে সর্বজ্ঞানী।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৭৬]

অতএব, এইটুকু পরিষ্কার ও স্পষ্ট কথাকে কেনো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, যার কারণে ইউসুফ আ.-এর উক্তিকে 'তাওরিয়াহ' নামক বাক্‌পদ্ধতির আওতাভুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে? এবং এমন অর্থ কেনো গ্রহণ করা হয় যাতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং সেটার জন্য অযৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন না হয়?

যাইহোক। হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, দেখো, তোমরা আবারো একবার মিসরে যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাই বিনইয়ামিনের অনুসন্ধান করো। আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিও না। কেননা, আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কাফেরদের স্বভাব।

এ-বিষয় পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে এভাবে—

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (سورة يوسف)

(ইয়াকুব আ. বললেন,) 'হে আমার পুত্রগণ, তোমরা (মিসরে) যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের (বিনইয়ামিনের) অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ, আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ নিরাশ হয় না।' [সুরা ইউসুফ: আয়াত ৮৭]

হযরত ইয়াকুব আ. এখানে বিনইয়ামিনের সঙ্গে ইউসুফের নামও উল্লেখ করলেন। অথচ বাহ্যত এ-জায়গার বক্তব্যের সঙ্গে হযরত ইউসুফ আ.-এর অনুসন্ধানের কোনো সম্পর্কই নেই। কারণ দীর্ঘকাল থেকে তাঁর কোনো সন্ধান নেই। হযরত ইয়াকুব আ.-কে জানানো হয়েছিলো যে, ইউসুফ আ.-কে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। কাজেই এখানে বিনইয়ামিনের সঙ্গে ইউসুফের নাম উল্লেখ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং মনে হয়, আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াকুব আ.-এর শোক ও দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটাতে ইচ্ছা করেছেন এবং ইয়াকুব আ.-কে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বিনইয়ামিনের এই ঘটনায় ইউসুফ আ.-এর সাক্ষাৎ লাভের রহস্যও নিহিত রয়েছে। এ-কারণেই তো হযরত ইউসুফ আ.-এর সুসংবাদের পয়গাম আসার সঙ্গে সঙ্গে (যার বিবরণ একটু পরেই আসছে) হযরত ইয়াকুব আ. বলেছিলেন—

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'আমি কি তোমাদের বলি নি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না?' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৯৬]

যাইহোক। ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা কিছুটা পিতার পীড়াপীড়িতে এবং কিছুটা এইজন্য যে, বাস্তবিকই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা চরম পর্যায়ে পৌছেছিলো এবং আশপাশে শস্যের নামগন্ধ পর্যন্ত ছিলো না, তৃতীয়বার মিসরে সফরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁরা বাদশাহর দরবারে পৌছে বলতে লাগলেন, হে আযিয, দুর্ভিক্ষ আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবারবর্গকে চরম দুর্দশায় পতিত করেছে। এবার আমরা মূল্যও খুব সামান্যই এনেছি। এই তা গ্রহণ

করুন। এখন ক্রয়-বিক্রয় এবং লেন-দেনের ব্যাপার নয়। আমাদের দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং, আপনার খেদমতে আমাদের আবেদন এই যে, অনুগ্রহ করে খাদ্যশস্য পূর্ণমাত্রায় ওজন করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবী মনে করে আপনার পক্ষ থেকে দয়া করুন। আল্লাহ তাআলা সদকা-খয়রাত দাতাগণকে উত্তম বিনিময় দান করে থাকেন।

হযরত ইউসুফ আ. যখন পিতামাতা ও ভাইদের এই দুরবস্থা ও দুর্দশার কথা শুনলেন এবং তাঁদের বিনীত আবেদন ও অভাবমূলক প্রার্থনায় বাধ্যকারী অবস্থা চিন্তা করলেন, তাঁর হৃদয় করুণায় বিগলিত হলো। এখন আর দৃঢ় থাকতে পারলেন না যে, নিজেকে গোপন রাখেন এবং রহস্য প্রকাশ না করেন। অবশেষে বলতে শুরু করলেন—

هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (سورة يوسف)

'তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদর ভাইয়ের প্রতি কেমন আচরণ করেছিলেন, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৮৯]

ভাইয়েরা এই অবস্থায় অপ্রত্যাশিত কথা-বার্তা শুনে চমকে উঠলেন। ইউসুফ আ.-এর কথার ধরনের ওপর গভীরভাবে লক্ষ করে হঠাৎ তাঁদের কিছু একটা মনে হলো এবং তাঁরা বলে উঠলেন—

أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ

'সত্যিকার অর্থে আপনিই কি ইউসুফ?'

অর্থাৎ তাঁরা এই অস্থিরতা ও উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন যে, আমরা তো আযিযে মিসরের সামনে দণ্ডায়মান, তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা বলছি। এখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ইউসুফের আলোচনা কেনো? তাঁরা তখন তাঁর আকার-আকৃতি, কথা বলার ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদিকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে চিন্তা করে দেখলো। তাঁদের চোখের সামনে ইউসুফ আ.-এর আকৃতিই ভেসে উঠলো এবং তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, নিঃসন্দেহে ইনি ইউসুফ। কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ করে স্বাভাবিকভাবেই এ-কথা বলার সাহস পেলেন না যে, আপনি ইউসুফ। বরং স্থান-কাল ও পাত্রের উপযোগী সুর ও স্বরে তাঁরা বলে উঠলেন, আপনি কি বাস্তবিকই ইউসুফ?

হযরত ইউসুফ আ. বললেন—

أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (سورة يوسف)

'আমিই ইউসুফ আর এই আমার সহোদর ভাই (বিনইয়ামিন); আল্লাহ তো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে-ব্যক্তি মুত্তাকি ও ধৈর্যশীল, (যারা মন্দকাজ থেকে নিজেদের রক্ষা করে এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধরে) আল্লাহ তেমন সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' [সূরা ইউসুফ: আয়াত ৯০]

এখন হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা ইউসুফ আ.-এর কাছে অনুতপ্ত, লজ্জিত ও অপমানিত হওয়া এবং দোষ-ত্রুটি স্বীকার করা ছাড়া আর কী করতে পারেন। একইসঙ্গে হযরত ইউসুফ আ.-কে শেষ করে দেয়ার জন্য তাঁরা যেসব ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেগুলোর চিত্র তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তাঁরা পরিষ্কারভাবে এই সত্য অনুধাবন করতে পারলেন যে, তাঁরা যাকে গতকাল কিনআনের কূপে ফেলে এসেছিলো তিনি আজ আযিযে মিসর; বরং মিসরের রাজমুকুট ও সিংহাসনের মালিক। তখন তাঁরা অবনত মস্তকে বলে উঠলেন—

تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ

'আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় (এতে কোনো সন্দেহ নেই যে,) আল্লাহ তোমাদের আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন (শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন) এবং আমরা তো (আপাদমস্তক) অপরাধী ছিলাম।' [সূরা ইউসুফ: আয়াত ৯১]

হযরত ইউসুফ আ. তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের দুরবস্থা ও লজ্জা প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর উন্নত চরিত্র এবং নবীসুলভ দয়া ও করুণ তা বরদাশত করতে পারলো না। তিনি ক্ষমা, ধৈর্য ও দয়ার সঙ্গে বলে উঠলেন—

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই (তিরস্কার ও নিন্দা নেই)। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (অনুগ্রহকারীদের চেয়ে অধিক অনুগ্রহশীল।)' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯২]

অর্থাৎ, যা-কিছু হওয়ার ছিলো তা হয়ে গেছে। এখন আমাদের সবারই এই ঘটনা ভুলে যাওয়া উচিত। আমি আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করছি, তিনি

যেনো আপনাদের এই ভুল ক্ষমা করে দেন। কেননা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

এখন আপনারা কিনআনে ফিরে এবং আমার এই জামাটি নিয়ে যান। জামার আমার পিতার চোখের ওপর রাখুন। ইনশাআল্লাহ, ইউসুফের গন্ধ তাঁর চোখ দুটির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবে। এরপর আপনারা পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিসরে চলে আসুন।

হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইদের জন্যও এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? তাঁরা ইউসুফকে কিনআনের কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর মিথ্যা রক্তমাখা জামা ইয়াকুব আ.-এর কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তাঁর হৃদয় ও কলজেকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিলেন। আজকেও তাঁদেরকে ইউসুফ আ.-এর জামা নিয়ে যেতে হবে, যাতে সেই ক্ষতের উপশম হয় এবং শোক ও দুঃখ আনন্দ ও সুখে পরিণত হয়।

এখানেই এসব আলোচনা সমাপ্ত হয়ে গেলো। ইউসুফ আ.-এর ভাইদের কাফেলা ইউসুফ আ.-এর জামা নিয়ে কিনআনের পথে যাত্রা করলেন। ওদিকে আল্লাহ তাআলার মনোনীত নবী হযরত ইয়াকুব আ.-কে আল্লাহর ওহি ইউসুফ আ.-এর গন্ধ শুঁকিয়ে দিলো। তিনি বললেন, হে ইয়াকুবের বংশধর, তোমরা যদি এ-কথা না বলো যে, বৃদ্ধকালে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তারা সবাই বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম, আপনি আপনার সেই পুরনো বিভ্রান্তির মধ্যেই পড়ে রয়েছেন। অর্থাৎ, এত দীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পরও, যখন ইউসুফের নামচিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেছে, আপনি সেই ইউসুফের কথাই আওড়াচ্ছেন।

কিনআনগামী কাফেলা পূর্ণ কল্যাণ ও নিরাপত্তার সঙ্গে কিনআনে পৌছালো। হযরত ইউসুফ আ.-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁর জামা ইয়াকুব আ.-এর চোখের ওপর রাখতেই তৎক্ষণাৎ ইয়াকুব আ. দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন এবং বলে উঠলেন, দেখো, আমি বলছিলাম না যে আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন বিষয় জানতে পারি যা তোমরা জানো না। পবিত্র কুরআনে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورة يوسف)

'এরপর যখন সুসংবাদবাহ (কিনআনের কাফেলা নিরাপদে এসে) উপস্থিত হলো এবং তার (ইয়াকুব আ.-এর) মুখমণ্ডলের ওপর জামাটি রাখলো তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। সে (ইয়াকুব আ.) বললো, 'আমি কি তোমাদের বলি নি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না?' [সুরা ইউসুফ: আয়াত ৯৬]

ইউসুফ আ.-এর ভাইদের জন্য এই সময়টুকু বড় কঠিন সময় ছিলো। অনুতাপ ও লজ্জায় নিমজ্জিত মস্তক অবনত করে বললো, পিতা, আল্লাহপাকের দরবারে আমার পাপসমূহ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করুন। কেননা, এখন প্রকাশই হয়ে গেলো যে, আমরা ভীষণ দোষী ও অপরাধী। হযরত ইয়াকুব আ. বললেন—

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'আমি শিগগিরই আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৯৭]

মুফাস্‌সিরগণ বলেন, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা মিসরে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ইউসুফ আ.-এর কাছেও পাপ মার্জনার দোয়া চেয়েছিলেন। তাঁরা কিনআনে ফিরে এসে হযরত ইয়াকুব আ.-এর কাছে সেই একই আবেদন জানালেন। হযরত ইউসুফ আ. তখনই তাঁদের আবদন মঞ্জুর করে বলেছিলেন, يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ 'আল্লাহ আপনাদের ক্ষমা করুন'; কিন্তু হযরত ইয়াকুব আ. তেমন দোয়া না করে বললেন, سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ 'আমি শিগগিরই তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো'।

দোয়া করবেন বলে শুধু আশাই প্রদান করলেন; দোয়া করলেন না। এই পার্থক্যের কারণ কী? মুফাস্‌সিরগণ এই প্রশ্নের দুটি জবাব দিয়েছেন :

১. ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদের সব অপরাধের ব্যাপারে নিজেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আর সেসব অপরাধ ইউসুফ আ.-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ছিলো হযরত ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে। হযরত ইউসুফ আ. নিজের দয়ালু স্বভাববশত তাঁদেরকে তৎক্ষণাৎ সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আ. মনে করলেন, এ-ব্যাপারগুলোর সম্পর্ক ইউসুফের সঙ্গে, সুতরাং তার মতামতই জেনে নেয়া

উচিত। কাজেই তিনি এমন জবাব দিলেন, যাতে কথা কেবল আশা ও সম্ভাবনা পর্যন্তই থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মনের ঝোঁকও প্রকাশ করে দিলেন, আমার ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

২. হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন যুবক। তাঁর দয়া ও উদারতাগুণে দৃঢ়তা ও সতর্কতার দিকটি প্রবল ছিলো না। কাজেই তিনি দয়ার্দ্র হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আ. ছিলেন অভিজ্ঞ ও সাবধানতা অবলম্বনকারী এবং তিনি ছিলেন তাঁদের পিতা। তাই তিনি পুত্রদেরকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন : দেখা যাক, এদের এই অনুতাপ ও লজ্জা প্রকাশ সাময়িক এবং শুধু বর্তমান অবস্থাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা কি-না; না-কি সত্য সত্যই তাদের মনে অনুতাপ, লজ্জা ও অপরাধবোধের উদয় হয়েছে এবং বাস্তবিকই তারা তাদের কৃত অপরাধের জন্য সততার সঙ্গে অনুতপ্ত হয়েছে। তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করলেন না। কেবল আশা ও সম্ভাবনা পর্যন্ত ব্যাপারটি শেষ করে দিলেন।

হযরত ইয়াকুব আ.-এর পরিবারবর্গ মিসরে

মোটকথা, হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাওরাতে এই ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ আছে। তা নিম্নলিখিত শব্দমালায় বর্ণনা করা হয়েছে :

'আর ফেরআউনের ঘরে এই আলোচনাই শোনা গেলো যে, ইউসুফের ভাইয়েরা এসেছে এবং তাতে ফেরআউন ও তাঁর আমাত্যবর্গ খুবই সন্তুষ্ট হলেন। আর ফেরআউন ইউসুফকে বললেন, আপনি আপনার ভাইদেরকে বলুন, তোমরা এই কাজ করো, তোমাদের বাহন পশুগুলোকে বোঝাই করো এবং যাও, কিনআন দেশে গিয়ে পৌঁছাও। তোমাদের পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে নিয়ে আমার কাছে চলে এসো। আমি তোমাদেরকে মিসর দেশের ভালো ভালো বস্তু প্রদান করবো। আর তোমরা এই দেশের পারিতোষিক ও উপঢৌকনসমূহ খাবে। এখন তুমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছো। সুতরাং তুমি তাদেরকে বলো, তোমরা এই কাজ করো, তোমাদের সন্তান ও স্ত্রীগণের জন্য মিসর থেকে গাড়ি নিয়ে যাও এবং তোমাদের পিতাকে নিয়ে আসো। তোমাদের মাল ও আসবাবপত্রের জন্য কোনো প্রকার আফসোস করো না। গোটা মিসর দেশের আনন্দ তোমাদের কারণেই। ইসরাইলের

পুত্রগণ সেটাই করলো। ইসরাইল তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিরাপত্তার সঙ্গে মিসরে এলেন। তিনি তাঁর পুত্র ও পৌত্রদেরকে, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর কন্যাদেরকে ও কন্যাদের কন্যাদেরকে এবং সব বংশধরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে মিসরে এলেন। সুতরাং ইয়াকুবের পরিবারে যাঁরা ছিলেন সবাই মিসরে চলে এলেন। তাঁরা সংখ্যায় মোট ছিলেন সত্তর জন।'[৩০]

হযরত ইউসুফ আ. যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা পরিবারের সবাইকে নিয়ে শহরের কাছে এসে পৌঁছেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাইরে বের হলেন। হযরত ইয়াকুব আ. দীর্ঘকাল যাবৎ বিচ্ছিন্ন কলজের টুকরোকে দেখামাত্রই টেনে নিয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। এক আনন্দঘন ও আবেগময় সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। হযরত ইউসুফ আ. তাঁর সম্মানিত পিতার খেদমতে আরজ করলেন, আপনি এখন সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে শহরের দিকে তাশরিফ নিয়ে চলুন। তৎকালে মিসরের রাজধানী ছিলো রাআমসিস। এক উৎসবের শহর বলা হতো। হযরত ইউসুফ আ. সম্মানিত পিতা ও পরিবারের সব সদস্যকে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে রাজকীয় বাহনের ওপর বসিয়ে শহরে নিয়ে এলেন এবং রাজপ্রাসাদে নামালেন।

এইসব কাজ শেষ করে তিনি আম দরবারের অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা করলেন। যাতে তাঁর সম্মানিত পিতা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে মিসরবাসীদের পরিচয় হয়ে যায় এবং দরবারের আমির-উমারাগণও তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যান। দরবার বসলো। রাজকর্মচারীগণ তাঁদের নির্দিষ্ট আসনে বসে গেলেন। হযরত ইউসুফ আ.-এর নির্দেশে তাঁর পিতা-মাতাকে[৩১] রাজসিংহাসনেই স্থান দেয়া হলো। পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী নিচে বসলেন। শৃঙ্খলার সঙ্গে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো। তখন হযরত ইউসুফ আ. রাজমহল থেকে বের হয়ে রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরবারে উপবিষ্ট সবাই রাজ্যের প্রথানুযায়ী সিংহাসনের সামনে সম্মানপ্রদর্শকসূচক সিজদা[৩২] করলেন। উপস্থিত অবস্থা দেখে হযরত

---

[৩০] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৫, আয়াত ১৬-২০ এবং অনুচ্ছেদ ৪৬, আয়াত ৭ ও ২৭।

[৩১] ইনি হযরত ইউসুফ আ.-এর সৎমা। তাঁর আপন মা মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

[৩২] সম্মান প্রদর্শনের এই রীতি সম্ভবত পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রে জায়েয ছিলো। অবশ্য এ-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে এবং আমার কাছে এই আয়াতের একটি ভিন্ন তাফসির আছে। তা আমি (লেখক) ইচ্ছাকৃতভাবেই এখানে উল্লেখ করি নি। যাইহোক। নবী করিম

ইউসুফ আ.-এর পরিবারের সদস্যগণও অনুরূপভাবে সিজদা করলেন। এই অবস্থা দেখে হযরত ইউসুফ আ.-এর শৈশবকালের স্বপ্নটির কথা মনে পড়লো এবং তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বললেন—

يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (سورة يوسف)

'হে আমার পিতা, এটাই আমার পূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্য (যা আমি দীর্ঘকাল পূর্বে দেখেছিলাম): আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত (বাস্তবায়িত) করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সঙ্গে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ (সবকিছুই অবগত আছেন), (এবং নিজের যাবতীয় কাজে) প্রজ্ঞাময়।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ১০০]

এসব ঘটনা বিস্ময়কর ও অভিনবরূপে ঘটে যাচ্ছিলো এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলার মহিমা ও কৌশলের অভাবনীয় প্রকাশ দেখা যাচ্ছিলো। এসব ঘটনার শুরু ও শেষ পরিণতির এমন সুন্দর সমাপ্তি দেখে হযরত ইউসুফ আ. আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তিনি আল্লাহর দরবারে শোকর ও দোয়া করলেন—

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (سورة يوسف)

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছো। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তুমিই ইহলোকে ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।' [সূরা ইউসুফ: আয়াত ১০১]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য এ-ধরনের সম্মানপ্রদর্শন নিষিদ্ধ ও হারাম করেছেন। সিজদা কেবল এক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। [সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, আন-নিকাহ অধ্যায়।

তাওরাতে ঘটনাটি বর্ণিত আছে যে, এই ঘটনার হযরত ইউসুফ আ.-এর বংশের সব সদস্য মিসরেই বসবাস করতে শুরু করলেন। কেননা, ফেরআউন হযরত ইউসুফকে খুব অনুরোধ করে বললেন, আপনি আপনার বংশধরদেরকে মিসরেই বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিন। আমি তাঁদেরকে খুব উত্তম ভূমি দেবো এবং সব ব্যাপারেই তাঁদের সম্মান করবো।

ফেরআউনের কথা শুনে হযরত ইউসুফ আ. তাঁর সম্মানিত পিতা ও পরিবারের সব সদস্যকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ফেরআউন যখন আপনাদেরকে মিসরে বসবাস করার অনুরোধ করবেন এবং জায়গা ও জমি নির্বাচন করার জন্য বলবেন, তখন আপনারা অমুক অংশের জমি চাইবেন। তাঁকে বলবেন, যেহেতু আমরা যাযাবর জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং গৃহপালিত পশু চরাতে আগ্রহী, তাই শহুরে জীবন থেকে পৃথক থাকাই আমাদের জন্য পছন্দনীয়। ফলে ফেরআউন ইউসুফ আ.-এর পরিবারবর্গকে জায়গির হিসেবে সেই অংশের জমিটুকু দিলেন। এভাবেই বনি ইসরাইল মিসরে বসবাস করতে শুরু করলো।

'এবং ফেরআউন ইউসুফকে বললেন, আপনি আপনার ভাইদেরকে বলুন, তোমরা এই কাজ করো, তোমাদের বাহন জন্তুগুলোকে বোঝাই করে নাও এবং কিনআন দেশে গিয়ে পৌছাও। এরপর তোমাদের পিতাকে এবং পরিবারবর্গকে নিয়ে আমার কাছে চলে এসো। আমি তোমাদেরকে মিসর দেশের ভালো ভালো বস্তু প্রদান করবো আর তোমরা জমিনে উৎপন্ন শস্য ভোগ করবে। এখন আপনাকে আদেশ দেয়া হলো যে, আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা এই কাজ করো, তোমাদের সন্তান-সন্তুতি ও স্ত্রীদের জন্য মিসর থেকে গাড়ি নিয়ে যাও এবং তোমাদের পিতাকে নিয়ে আসো। তোমাদের মাল ও আসবাবপত্রের জন্য কোনো চিন্তা করো না। কারণ, তোমাদের জন্য মিসরবাসীদের সব আনন্দ। ইসরাইলের সন্তানগণ তা-ই করলো।'[৩৩]

'আর যখন এমন হবে যে, ফেরআউন তোমাদেরকে ডাকবে এবং জিজ্ঞেস করবে তোমাদের পেশা কী, তখন তোমরা বলো, আপনার গোলামেরা যৌবন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন ও চরিয়ে আসছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তা-ই করতেন। ফেরআউন বললেন, তোমরা

---

[৩৩] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৬, আয়াত ১৬-১৯।

আনন্দময় ভূমিতে থাকবে। কেননা, মিসরবাসীরা সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুকে ঘৃণা করে।'[৩৪]

হযরত ইউসুফ আ.-এর উদ্দেশ্য ছিলো এটা যে, এইভাবে মিসরবাসীগণ থেকে পৃথক থাকলে বনি ইসরাইল তাঁদের ধর্মীয় জীবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা মিসরবাসীদের মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে এবং মিসরের অসৎ চরিত্র, নিম্নমানের শহুরে অভ্যাস ও স্বভাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারবে। এভাবে তারা তাদের সাহসিকতাপূর্ণ যাযাবর জীবনকে কখনো ভুলবে না।

১১০ বছর বয়সে ইন্তেকাল

হযরত ইউসুফ আ. জীবনের অধিকাংশ সময়ই মিসরে কাটিয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন একশো দশ বছরে পৌঁছে তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরত ইউসুফ আ. মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বংশের লোকদের থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা যেনো তাঁকে মিসরের মাটিতে দাফন না করেন। বরং যখন আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে এবং বনি ইসরাইল পুনরায় ফিলিস্তিনের ভূমিতে অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের দেশে ফিরে যাবে, তখন তাঁরা যেনো তাঁর হাড়গোড়গুলো ওখানে নিয়ে যান এবং মাটির নিচে দাফন করেন। ইউসুফ আ.-এর কাছে তাঁরা এভাবেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

হযরত ইউসুফ আ. মৃত্যুবরণ করলে তাঁরা তাঁকে মমি করে সিন্দুকের ভেতর ভরে রেখে দিলেন। হযরত মুসা আ.-এর যুগে বনি ইসরাইল যখন মিসর থেকে বের হলো, তারা সেই সিন্দুকটিও সঙ্গে নিয়ে গেলো এবং পূর্বপুরুষদের দেশ ফিলিস্তিনে নিয়েই দাফন করলো। হামাবি বলেন, ইউসুফ আ.-এর কবর ফিলিস্তিনের নাবলুসের অন্তর্গত বালাতা গ্রামে অবস্থিত। একটি বৃক্ষের ছায়ায় ইউসুফ আ.-এর মাজার।

তাওরাতে বর্ণিত আছে :

'আর ইউসুফ এবং তাঁর পিতার পরিবারবর্গ মিসরে বসবাস করেছেন। ইউসুফ আ. একশো দশ বছর জীবিত ছিলেন। ইউসুফ আ. আফরাইমের সন্তানকে, যারা ছিলো তৃতীয় পুরুষ—দেখেছেন এবং মুনাস্সার সন্তান মাকিরের পুত্রও ইউসুফ আ.-এর কোলে প্রতিপালিত হয়েছিলো। ইউসুফ আ. তাঁর

---

[৩৪] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৬, আয়াত ৩৩-৩৪।

ভাইদেরকে বললেন, আমি মারা যাচ্ছি, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তোমাদেরকে মিসর থেকে সেই এলাকার দিকে নিয়ে যাবেন, যার ব্যাপারে তিনি ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালামকে শপথের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইউসুফ আ. বনি ইসরাইল থেকে শপথ গ্রহণ করে তাদেরকে বললেন, আল্লাহপাক নিশ্চয় তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। তোমরা আমার হাড়গুলোকে এখান থেকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। এরপর ইউসুফ আ. একশো দশ বছর বয়সে পৌঁছে ইন্তেকাল করলেন। বনি ইসরাইল মিসরে তাঁর মৃতদেহের মধ্যে সুগন্ধিদ্রব্য পূর্ণ করে একটি সিন্দুকের ভেতর রেখে দিলো।'[৩৫]

'মুসা আ. বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ইউসুফ আ.-এর হাড়গুলোকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেননা, ইউসুফ আ. বনি ইসরাইলকে দৃঢ়তার সঙ্গে কসম কাটিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদের খবর নেবেন। তোমরা আমার হাড়গুলোকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।'[৩৬]

অতি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বিষয়সমূহ

হযরত ইউসুফ আ.-এর এই বিস্ময়কর ও অভিনব কাহিনিতে চক্ষুষ্মান ও ধীসম্পন্ন মানুষের জন্য কতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বিষয় বিদ্যমান। আসলে এই কাহিনি শুধু একটি ঘটনাই নয়। ফযিলত ও আখলাকের এমন এক সুবর্ণ কাহিনি যার প্রত্যেকটা দিক উপদেশ ও জ্ঞানের মণি-মুক্তা দ্বারা কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

ঈমানি শক্তি, দৃঢ়তা, আত্মসংযম, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমা, দাওয়াত ও তাবলিগের আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার স্পৃহা, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহভীতি ইত্যাদি উচ্চস্তরের আখলাক ও গুণাবলির এক দুর্লভ স্বর্ণশৃঙ্খল, যা এই কাহিনির পরতে পরতে দেখা যায়। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. যদি কোনো ব্যক্তির আপন স্বভাব ও প্রকৃতি উত্তম হয় এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশও পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির জীবন মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং উচ্চস্তরের গুণাবলিতে অলঙ্কৃত হবে। তিনি সবধরনের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার ধারক-বাহক হবেন।

---

[৩৫] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫, আয়াত ২২-২৬।

[৩৬] তাওরাত : আত্মপ্রকাশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৩, আয়াত ১৯।

হযরত ইউসুফ আ.-এর জীবন এরই এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি হযরত ইয়াকুব, ইসহাক ও ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাম-এর মতো অতি উচ্চ মর্যাদাবান নবী ও রাসুলের সন্তান ছিলেন। ফলে তিনি নবুয়ত ও রিসালাতের দোলনায় লালিত-পালিত হন। নবুয়ত ও রিসালাতের পরিবারের পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর আপন সৎ প্রকৃতি এবং স্বভাবগত পবিত্রতা যখন এমন পরিবেশ পেলো, তখন তাঁর যাবতীয় প্রশংসনীয় গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ফলে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যে জীবনের প্রতিটি প্রান্ত আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, দীনদারি, আল্লাহপ্রেমের এমন দীপ্তিমান বিকাশস্থল হয়ে উঠলো যে, মানুষের মস্তিষ্ক এতগুলো পূর্ণ গুণের সন্নিবেশযুক্ত একজন মানুষকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়।

২. যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান সত্য ও সুদৃঢ় হয় এবং আল্লাহর ওপর তার বিশ্বাস শক্তিশালী ও দৃঢ়মূল হয়, তবে এই পথের যাবতীয় জটিলতা ও সঙ্কট তার জন্য সহজ ও সহজতর হয়ে যায়। সত্যদর্শনের পর সব ধরনের বিপদ-আপদ অতি তুচ্ছ হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ আ.-এর গোটা জীবনের মধ্যে এ-বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

৩. পরীক্ষা, বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত ও ধ্বংসের অবস্থায়ই হোক অথবা ধন-দৌলত এবং প্রবৃত্তির কামনা-বসনার সুন্দর সুন্দর উপকরণ প্রাপ্তির অবস্থায়ই হোক—সর্বাবস্থায় মানুষের উচিত আল্লাহর প্রতি বিনীত ও একনিষ্ঠ থাকা। আল্লাহর দরবারেই কাকুতি-মিনতি করা, যেনো তিনি সত্যের ওপর অটল রাখেন এবং দৃঢ়তা দান করেন।

আযিযে মিসরের স্ত্রী এবং মিসর শহরের সুন্দরী রমণীদের অসৎ প্ররোচনা এবং তাদের মনস্কাম পূর্ণ না করলেন কারাগারে আবদ্ধ রাখার হুমকি, এরপর কারাগারে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট—এসব অবস্থায় হযরত ইউসুফ আ.-এর নির্ভর, তাঁর প্রার্থনা এবং কাকুতি-মিনতির কেন্দ্রস্থল একমাত্র আল্লাহর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। তাঁকে আযিযে মিসরের সামনে আবেদন করতেও দেখা যায় না। ফেরআউনের দরবারেও আবদার করতে দেখা যায় না। তিনি মিসরের সেই সুন্দরী রমণীদের প্রতি মন লাগান নি; তাঁর প্রভুর সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি মন দেন নি। বরং সব ক্ষেত্রে তাঁকে আল্লাহ তাআলার সাহায্যপ্রার্থীই দেখা যায়। যেমন তিনি বলেছেন, رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ 'হে আমার প্রতিপালক, এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়।' তিনি আরো বলেছেন—

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি (আযিযে মিসর) আমার প্রভু; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন।'

৪. যখন আল্লাহ তাআলা ইশক ও মুহাব্বত অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে, তখন তিনিই হয়ে যান মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ ও উদ্দেশ্য। তাঁর দীনের দাওয়াত ও তাবলিগের স্পৃহা সর্বক্ষণ ধমনী ও স্নায়ুতে সক্রিয় থাকে। যেমন কারাগারের কঠিন বিপদের সময়ও তাঁর সঙ্গীদের হযরত ইউসুফ আ.-এর প্রথম কথা ছিলো এটাই—

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

'হে কারা-সঙ্গীদ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩৯]

৫. দীনদারি ও বিশ্বস্ততা এমন একটি নেয়ামত, একে মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। আযিযে মিসরের গৃহে হযরত ইউসুফ আ. কীভাবে প্রবেশ করেছিলেন, ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ থেকে তা জানা গেছে। এটা হযরত ইউসুফ আ. দীনদারি ও বিশ্বস্ততার ফর ছিলো যে, প্রথমে তিনি আযিযে মিসরের দৃষ্টিতে উচ্চমর্যাদাবান ও প্রিয়ভাজন হন। এরপর তিনি গোটা মিসর রাজ্যেরই মালিক হয়ে যান।

৬. আত্মনির্ভরশীলতা মানুষের উচ্চস্তরের গুণাবলির অন্তর্গত একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ তাআলা যাঁকে এই দৌলত দান করেন তিনি দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে ইহলোক ও পরলোকের সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জন করতে পারেন।

আত্মনির্ভরশীলতার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার হলো আত্মমর্যাদাবোধ। যার আত্মমর্যাদাবোধ নেই, সে মানুষই নয়। একখণ্ড মাংসপিণ্ড মাত্র। হযরত ইউসুফ আ.-এর আত্মসম্মান রক্ষার অবস্থা এই ছিলো যে, বহু বছর যখন কারাগার থেকে মুক্তিলাভের আদেশপ্রাপ্ত হন এবং তৎকালীন বাদশাহর পক্ষ থেকে সম্মানজনক সুসংবাদ লাভ করেন, তখন আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তৎক্ষণাৎই এই সংবাদকে অভিনন্দন জানান নি; বরং পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকৃতি জানিয়ে দেন যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কারাগার থেকে বের হবো না, যতক্ষণ না এই মীমাংসা হয়ে যায় যে, মিসরীয়

রমণীরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার সঙ্গে যে-আচরণ করেছে তার প্রকৃত অবস্থা কী। যেমন : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (سورة يوسف)

'তুমি তোমার প্রভুর (বাদশহর) কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো যে-নারীরা হাত কেটে ফেলেছিলো তাদের অবস্থা কী? নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।' [সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫০]

৭. সবর ও ধৈর্য একটি অতি উচ্চ স্তরের স্বভাব এবং অনেক খারাপ কাজের জন্য বাধা ও ঢালস্বরূপ। পবিত্র কুরআন সত্তরেরও বেশি জায়গায় সবরের ফযিলতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা অনেক উচ্চমর্যাদার মূলসূত্র এই ফযিলতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (سورة السجدة)

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে (অনুসরণীয় ও বরেণ্য) নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো (তারা সবরের ফযিলতের অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন)। আরা তারা ছিলো আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।' [সূরা আস-সিজদা : আয়াত ২৪]

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا (سورة الأعراف)

'এবং বনি ইসরাইল সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, এ-কারণে যে, তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো।' [সূরা আরাফ : আয়াত ১৩৭]

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে ওঠে :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' [সূরা বাকারা: আয়াত ১৫৫-১৫৬]

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

'সুতরাং (হে মুহাম্মদ), তুমি ধৈর্য ধারণ করো যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (দৃঢ় সংকল্পকারী) রাসুলগণ।' [সুরা আহকাফ : আয়াত ৩৫]

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

'তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য প্রার্থনা করো আর এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর সবার কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৪৫]

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبر نصف الإيمان

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'ধৈর্য ঈমানের অর্ধাংশ।'[৩৭]

أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الإيمان قال الصبر و السماحة

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, 'ধৈর্য ও বদান্যতা।'[৩৮]

বাস্তবেই ধৈর্য এমন একটি গুণের নাম, যার মাধ্যমে মানুষ যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে, নফস মন্দ কাজের দিকে অগ্রসর হতে বিরত থাকে। সুতরাং এই গুণটি কেবল মানুষেরই বিশেষত্ব। এই গুণটিই মানুষকে অন্যসকল প্রাণী থেকে প্রথক করে দিয়েছে।

সবর ও ধৈর্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। অথবা এমন বলুন যে, যেসব বস্তুর প্রতি সবরের সম্পর্ক আরোপ করা হয় সেসব বস্তুর প্রতি লক্ষ করে 'সবর'কে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ক. যদি পেট ও লজ্জস্থানের প্রবৃত্তি ও কামনার মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করা হয় তবে একে বলা হয় 'ইফফাত', অর্থাৎ সংযম। খ. যদি বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা হয় তবে তাকে 'সবর'ই বলা হয়। এর বিপরীত অবস্থার নাম 'জাযআ' ও 'ফাযআ', অর্থাৎ অস্থিরতা ও উদ্বেগ। গ. যদি ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের সময় সবর করা হয় তবে তার নাম 'দবতে নফস', অর্থাৎ আত্মসংযম। এর বিপরীত অবস্থার 'বাতার', অর্থাৎ গর্ব ও অহমিকা। ঘ. যুদ্ধের ময়দানে ভয়াবহ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করার নাম 'শাজাআত', অর্থাৎ সাহসিকতা ও

---

[৩৭] শুআবুল ঈমান, বায়হাকি, হাদিস ৯৭১৬, ৯৭১৭।

[৩৮] শুআবুল ঈমান, বায়হাকি, হাদিস ৯৭১১।

বীরত্ব। এর বিপরীত অবস্থার নাম 'জুব্‌ন', অর্থাৎ ভীরুতা ও কাপুরুষতা। ঙ. ক্রোধ ও ক্ষোভের অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করার না 'হিলম', অর্থাৎ সহিষ্ণুতা। এর বিপরীত অবস্থা হলো 'তাযাম্মুর', অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়া। চ. যুগ ও কালের সঙ্কট ও দুর্দশার ওপর ধৈর্য ধারণ করার নাম 'উসআতে সদ্‌র', অর্থাৎ আত্মার বড়ত্ব ও উদারতা। এর বিপরীত অবস্থার নাম 'দাজর', অর্থাৎ অসন্তোষ ও অস্থিরতা। ছ. অন্যের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করার নাম 'কিতমানুস সির', অর্থাৎ অন্যের গোপনীয় বিষয় ও রহস্য গোপন রাখা। জ. জীবনরক্ষার পরিমাণ জীবিকার ওপর ধৈর্য ধারণ করার নাম 'কানাআত', অর্থাৎ অল্পেতুষ্টি। ঝ. সবধরনের আমোদ-প্রমোদ ও ভোগবিলাসের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করার নাম 'যুহ্‌দ', অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও অনীহা।

সবর বা ধৈর্যের এই প্রকারগুলোর ব্যাপক বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে ও অলৌকিক উপায়ে পবিত্র কুরআনে এই আয়াতে করা হয়েছে—

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورة البقرة)

'অর্থ-সঙ্কটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সঙ্কটে যারা ধৈর্য ধারণ করে। তারাই প্রকৃতপক্ষে সত্যপরায়ণ ও মুত্তাকি।' [সূরা বাকারা: আয়াত ১৭৭]

আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আ.-কে আয়াতে উল্লিখিত ধৈর্য ও সন্তুষ্টির যাবতীয় স্তরে এমন পূর্ণতা দান করেছিলেন যাকে উচ্চশ্রেণির গুণ বলা হয়। ক. ভাইদের কষ্ট প্রদানের অবস্থায় ধৈর্য ধারণ। খ. স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও ক্রীতদাস হয়ে থাকা এবং এমন দেশ ও সম্প্রদায়ের হাতে বিক্রীত হওয়ার ওপর ধৈর্য যারা সামাজিক আচরণে ও জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতিতে বিপরীত ছিলো এবং দীন ও ঈমানের দিক থেকে শত্রু ছিলো। গ. আযিযে মিসরের স্ত্রী ও মিসরীয় রমণীদের ছল-চাতুরিপূর্ণ প্ররোচনার ওপর ধৈর্য ধারণ। ঘ. কারাগারের দুঃখ-কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ। ঙ. আযিযে মিসরের যাবতীয় ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার ওপর ধৈর্য ধারণ। অর্থাৎ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অহঙ্কার ও আস্ফালন থেকে বেঁচে থাকা। চ. মিসর রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হওয়ার ওপর ধৈর্য ধারণ। অর্থাৎ জুলুম, অহমিকা ও আত্মগর্ব থেকে বেঁচে থাকা। ছ. (সঙ্কট ও প্রাচুর্য) উভয় অবস্থাতেই কানাআত (অল্পেতুষ্টি) ও যুহদের (দুনিয়ার প্রতি অনীহা) জীবনকে প্রাধান্য দেয়া। জ.

কষ্ট প্রদানকারী অনুতপ্ত হওয়ার সময় ধৈর্য ধারণ। অর্থাৎ উদারতা ও হৃদয়ের বড়ত্বের ওপর দৃঢ়তা।

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই (তিরস্কার ও নিন্দা নেই)। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (অনুগ্রহকারীদের চেয়ে অধিক অনুগ্রহশীল।)' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৯২]

৯. উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যে শোকর ও কৃতজ্ঞতাও একটি অতি উত্তম চারিত্রিক গুণ। কেননা, তা খোদায়ি স্বভাবসমূহের মধ্যে একটি অতি উচ্চ পর্যায়ের স্বভাব। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ 'আল্লাহ গুণগ্রাহী ও ধৈর্যশীল'।[৩৯] মানবিক গুণাবলির মধ্যে শোকর ও কৃতজ্ঞতা এমন একটি গুণের নাম যার দ্বারা প্রকৃত অনুগ্রহ ও নেয়ামতদাতার নেয়ামতের স্বীকার করা হয়। এর ওপর আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয় এবং সেই নেয়ামতকে নেয়ামতদাতা ও অনুগ্রহকারীর পছন্দনীয় উপায়ে ব্যবহার করা হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (سورة البقرة)

'সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।' [সুরা বাকারা: আয়াত ১৫২]

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (النساء)

'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহর কী কাজ? আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।'

[সুরা নিসা: আয়াত ১৪৭]

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেবো আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই শাস্তি হবে কঠোর।' [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৭]

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো মানবজগতে প্রকৃত শোকরগুযার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী খুবই কম। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

'আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।' [সুরা সাবা: আয়াত ১৩]

---

[৩৯] সুরা তাগাবুন : আয়াত ১৭।

কিন্তু হযরত ইউসুফ আ.-কে আল্লাহ তাআলা এই গুণটি পূর্ণমাত্রায় দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের অবস্থাগুলো পাঠ করুন এবং অনুমান করুন, কীভাবে তিনি জায়গায় জায়গায় শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে ঘটনার শেষভাগে তাঁর যে-দোয়াটি উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁর এই গুণটিকে অধিক স্পষ্ট করে তুলছে—

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছো। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তুমিই ইহলোকে ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।'
[সুরা ইউসুফ : আয়াত ১০১]

১০. হিংসা ও বিদ্বেষের পরিণাম হিংসুক এবং বিদ্বেষীর পক্ষেই ক্ষতিকর ও ভয়াবহ হয়ে থাকে। যদিও কোনো কোনো সময় হিংসা ব্যক্তির পার্থিব ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই হিংসুকের কল্যাণ হয় না। কারণ—

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ও আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।' [সুরা হজ: আয়াত ১১]

তবে যদি তওবা করে এবং হিংসুটে জীবন পরিত্যাগ করে তাহলে ভিন্ন কথা।

১১. সততা, দীনদারি, বিশ্বস্ততা , ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মতো উচ্চস্তরের গুণাবলিমণ্ডিত জীবনই প্রকৃত ও সফল জীবন। যদি মানুষের মধ্যে এসব গুণাবলি না থাকে, তবে মানুষ নয়, পশু; বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে—

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'তারা (অবাধ্য ও নাফরমান মানুষ) পশুর মতো, বরং তারা (পশুর চেয়েও) অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফেল (উদাসীন)।' [সুরা আরাফ: আয়াত ১৭৯]

১২. হযরত ইউসুফ আ.-এর মহৎ স্বভাব ও উচ্চস্তরের গুণাবলির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই উক্তিটি, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عز و جل

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তিনি মর্যাদাশীল, তাঁর পিতা মর্যাদাশীল, তাঁর পিতামহ মর্যাদাশীল এবং তাঁর প্রপিতামহও মর্যাদাশীল... ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম খলিলুর রহমান।'[৪০]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله

'সবচেয়ে সম্মানিত পুরুষ ইউসুফ আ. তিনি আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা আল্লাহর নবী, তাঁর পিতামহ আল্লাহর নবী, তাঁর প্রপিতামহ আল্লাহর নবী ও বন্ধু।'[৪১]

[৪০] মুসনাদে আহমদ : হাদিস ৫৭১২।

[৪১] সহিহ বুখারি : ৩২০৩।

হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম

পবিত্র কুরআনে হযরত শুআইব আ.-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআনে হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সম্প্রদায়ের আলোচনা সুরা আ'রাফ, সুরা হুদ ও সুরা শুআরার মধ্যে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর সুরা হিজর ও সুরা আনকাবুতে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুরা হিজর ব্যতীত এই সুরাগুলোর মধ্যে হযরত শুআইব আ.-এর নাম দশ জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত নকশাটি তার সত্যায়ন করছে :

সুরা	সুরার নাম	আয়াত	সংখ্যা
৭	সুরা আল-আ'রাফ	৮৫, ৮৮, ৯০, ৯২	৪
১১	সুরা হুদ	৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৫	৪
২৬	সুরা আশ-শুআরা	১৭৭	১
৩২	সুরা আল-আনকাবুত	৩৬	১

হযরত শুআইব আ.-এর সম্প্রদায়

হযরত শুআইব আ. মাদয়ানে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। মাদয়ান মূলত কোনো স্থানের নাম, এটি একটি সম্প্রদায় ও গোত্রের নাম।[৪২] এই সম্প্রদায়টি হযরত ইবরাহিম আ.-এর পুত্র মাদয়ানের বংশ থেকে উদ্ভূত। হযরত ইবরাহিম আ.-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার গর্ভে মাদয়ানের জন্ম হয়। এ-কারণে হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই বংশধরকে বনি কাতুরা নামে অভিহিত করা হয়।

'মাদয়ান তাঁর স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারবর্গসহ তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই হযরত ইসমাইল আ.-এর পাশেই হেজাযে বসবাস করতেন। এ-পরিবারই পরবর্তীকালে একটি বিরাট গোত্র বা গোষ্ঠীর আকার ধারণ করেছিলো। এই বংশ ও গোত্র থেকেই ছিলেন হযরত শুআইব আ.। তাই তাঁর নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার পর এই গোত্র 'কওমে শুআইব' বা 'শুআইবের সম্প্রদায়' বলে অভিহিত হতে লাগলো।

[৪২] এই সম্প্রদায়ের নাম অনুসারেই তাদের জনপদের নাম মাদয়ান বলে বিখ্যাত হয়েছিলো।

মাদয়ান ও আসহাবুল আইকাহ

মাদয়ান গোত্র কোথায় বসবাস করতো? এ-সম্পর্কে আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার বলেন, এরা হেজাযে শাম-সংলগ্ন এমন এক স্থানে বসবাস করতো যার অক্ষাংশ আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির অক্ষাংশ বরাবর অবস্থিত। আবার কেউ কেউ বলেন, শামের সঙ্গে মিলিত 'মাআন' নামক ভূখণ্ডে তারা বসবাস করতো।

পবিত্র কুরআন এই গোত্রের আবাসভূমি সম্পর্কে দুটি কথা জানিয়ে দিয়েছে।

১. তারা 'ইমামে মুবিন'-এর ওপর বসবাস করতো। যেমন: পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (سورة الحجر)

'এবং উভয়টিই (লুত ও শুআইবের সম্প্রদায়ের বসতির ধ্বংসস্তূপ) প্রকাশ্য পথের (বিরাট রাজসড়কের) পাশে অবস্থিত।' [সূরা হিজর : আয়াত ৭৯]

আরব দেশের ভূগোলে যে-রাজসড়কটি হেজাযের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোকে শাম, ফিলিস্তিন, ইয়ামান ও মিসর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং লোহিত সাগরের পূর্ব দিক থেকে চলে যায়, পবিত্র কুরআন এই সড়ককে 'ইমামে মুবিন' অর্থাৎ পরিষ্কার ও মুক্ত রাজসড়ক বলছে। কেননা, গ্রীষ্মকাল (صيف) ও শীতকাল (شتاء) উভয় ঋতুতেই কুরাইশ সম্প্রদায়ের বণিক কাফেলাগুলোর জন্য এটাই ছিলো বিখ্যাত ও বিরাট রাজপথ।[৪৩] এই পথের পরম্পরা স্থলভাগের সীমার সঙ্গে জলভাগের সীমারেখাকেও সংযুক্ত করে দিয়েছিলো।

২. তারা আসহাবুল আইকাহ (أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ) অর্থাৎ ঝোপ-ঝাড়ের অধিবাসী বলে অভিহিত হতো। আরবি ভাষায় আইকাহ বলা হয় সবুজবর্ণ ঝোপ-ঝাড়কে, যা সবুজ ও সজীব বৃক্ষলতার প্রাচুর্যের কারণে বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ঝোপের আকৃতি ধারণ করে।

---

[৪৩] 'তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মের সফরের।' [সুরা কুরাইশ : আয়াত ২] কুরাইশ সম্প্রদায় ছিলো ব্যবসায়ী। তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও শীতকালে ইয়ামানে গমন করতো।

এই দুটি বিষয় জেনে নেয়ার পর মাদয়ান গোত্রের বসতির সন্ধান সহজেই জানা যেতে পারে। তা হলো মাদয়ান গোত্রটি লোহিত সাগরের পূর্বতীরে এবং আরব দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি এলাকায় বসবাস করতো। এটিকে শামদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হেজাযের শেষাংশ বলা যেতে পারে। আর হেজাযবাসীরা শাম, ফিলিস্তিন, এমনকি মিসর পর্যন্ত যাতায়াতকালে 'আসহাবে মাদয়ান'-এর বসতির ভগ্নাবশেষগুলো পথে পড়তো। এগুলো ছিলো তাবুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত।

মুফাস্সিরগণ এ-বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন যে, 'আসহাবু মাদয়ান' ও 'আসহাবুল আইকাহ' একই গোত্রের দুটি নাম না-কি এরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্র।[৪৪] কারো কারো মতে এরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্র। মাদয়ান ছিলো একটি সভ্য ও শহুরে গোত্র। আর আসহাবুল আইকাহ ছিলো গ্রাম ও যাযাবর শ্রেণির গোত্র। তারা বনে-জঙ্গলে বসবাস করতো। এ-কারণে তাদেরকে 'আসহাবুল আইকাহ' বা বন-জঙ্গলের অধিবাসী বলা হয়েছে। এই অভিমত পোষণকারী মুফাস্সিরগণের মতে আয়াতে দ্বিবাচক সর্বনামটির লক্ষ্যস্থল এই দুটি গোত্র, অর্থাৎ মাদয়ান ও আসহাবুল আইকাহ-ই উদ্দেশ্য; মাদয়ান এবং লুত আ.-এর সম্প্রদায় নয়।

আবার অন্য মুফাস্সিরগণ গোত্র দুটিকে একই গোত্র সাব্যস্ত করেন। তাঁরা বলেন যে, জলবায়ুর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা এবং নদী-নালার প্রাচুর্য এই স্থানটিকে উৎকৃষ্ট ও মনোমুগ্ধকর করে তুলেছিলো। এখানে ফল, মেওয়া ও সৌরভময় ফুলের অসংখ্য বাগ-বাগিচা ছিলো। কেউ যদি এই বসতির বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে এর দিকে তাকাতো, তাহলে মনে হতো চমৎকার ও উৎকৃষ্ট ঘন বৃক্ষরাজির একটি ঝোপ। এ-কারণেই পবিত্র কুরআন একে আসহাবুল আইকাহ বলে পরিচয় দিয়েছে।

এই মুফাস্সিরগণের মধ্যে হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ.-এর ধারণা এই যে, এই বসতিতে আইকাহ নামের একটি বৃক্ষ ছিলো। গোত্রের লোকেরা ওই বৃক্ষটির পূজা করতো। এ-সম্পর্কের কারণে মাদয়ান গোত্রকেই 'আসহাবুল আইকাহ' বলা হয়েছে। তা ছাড়া এই সম্পর্কটি বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো না; বরং ধর্ম-সংক্রান্ত সম্পর্ক ছিলো। তাই যেসব আয়াতে তাদেরকে এই উপাধির সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যেসব আয়াতে হযরত শুআইব আ.-কে

---

[৪৪] মু'জামুল বুলদান, ইয়াকুত হামাবি, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৮।

اخوهم। অর্থাৎ তাদের ভাই বা এ-জাতীয় কোনো সম্পর্কের সঙ্গে উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য যেসব আয়াতে শুআইব আ.-এর কওমকে মাদয়ান বলা হয়েছে সেখানে হযরত শুআইব আ.-কেও বংশগত সম্পর্কের সঙ্গে اخوهم। অর্থাৎ তাদের ভাই বলা হয়েছে।

যাইহোক। প্রণিধানযোগ্য মত এটাই যে, মাদয়ান ও আসহাবে আইকাহ একই গোত্র ছিলো। তাদেরকে পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে মাদয়ান বলা হয়েছে এবং বসতভূমির প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থান হিসেবে তারা 'আসহাবুল আইকাহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

হযরত শুআইব আ.-এর নবুয়তকাল এবং একটি ভুলের অপনোদন

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে লিখেছেন, আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলি কালকাশান্দি রহ. তাঁর صبح الأعشى في صناعة الإنشاء গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

فملك بعده ابنه يؤثم ست عشرة سنة ويقال إن يونس عليه السلام كان في زمنه ثم ملك بعده ابنه آحاز ست عشرة سنة أيضا وكانت الحرب بينه وبين ملك دمشق وفي زمنه كان شعيب عليه السلام

'তাঁর (আযইয়াহু) পর তার পুত্র ইউসাম ষোলো বছর রাজত্ব করেছেন, বলা হয়ে থাকে, তাঁর শাসনামলে হযরত ইউনুস আ. নবী ছিলেন। ইউসামের পরে তার পুত্র আহাযও ১৬ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। তার মধ্যে এবং দামেস্কের অধিপতির মধ্যে যুদ্ধ চলতো। সে-সময়েই শুআইব আ. নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।'

কালকাশান্দির এই বক্তব্যের ফল দাঁড়ায় এই যে, হযরত শুআইব আ. হযরত মুসা আ.-এর কয়েক শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাতশত বছর পর অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ আহাযের রাজত্বকাল ছিলো এটাই। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তববিরোধী। কেননা, শুআইব আ. বয়সে হযরত মুসা আ. থেকে বড় এবং মুসা আ. শুআইব আ.-এর যুগ পেয়েছিলেন কি-না এ-বিষয়ে অবশ্য মতভেদ রয়েছে।

এ-কারণেই পবিত্র কুরআন সুরা আ'রাফে হযরত নুহ আ., হযরত হুদ আ., হযরত সালেহ, হযরত লুত এবং হযরত শুআইব আ.-এর উল্লেখের পর বলেছে, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا 'অতঃপর আমি তাদের পর মুসাকে আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১০৩]
সুরা ইউনুস, সুরা হজ, সুরা হুদ এবং সুরা আনকাবুতেও এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কালকাশান্দি এ-জায়গায় এই ভুল করে ফেলেছেন যে, তিনি (شعياء) শা'ইয়া আলাইহিমুস সালাম-এর স্থানে শুআইব আলাইহিস সালাম লিখে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, আহাযের রাজত্বকালই ছিলো শাইয়া আ.-এর যামানা।

সত্যের আহ্বান

যাইহোক। হযরত শুআইব আ. নবীরূপে তাঁর কওমের প্রতি প্রেরিত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহপাকের নাফরমানি ও পাপাচার কেবল গুটিকয়েক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গোটা সম্প্রদায়ই ধ্বংসের ঘূর্ণিপাকে আক্রান্ত ও লিপ্ত রয়েছে। তারা তাদের অসৎ কাজে এতটাই বিভোর ছিলো যে, তাদের কাছে একবারও মনে হয় নি এবং তারা অনুভবও করে নি যে তাদের কৃতকর্মসমূহ নাফরমানি ও পাপের কাজ; বরং তাদের ওই পাপকাজগুলোকে গর্বের বিষয় বলে মনে করছিলো। তাদের অসংখ্য অসচ্চরিত্রমূলক কর্মকাণ্ড এবং আবাধ্যচারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করলেও, কেবল যেসব মন্দকাজ বিশেষভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো তা এই:
১. প্রতিমাপূজা ও শিরকি রীতিনীতি;
২. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিজে পূর্ণ মাত্রায় মেপে নেয়া এবং অপরকে দিতে হলে ওজনে কম দেয়া;
৩. যাবতীয় লেন-দেনের ক্ষেত্রেই ছলচাতুরি ও ডাকাতি।
সম্প্রদায়গুলোর সাধারণ প্রথা অনুসারে প্রকৃতপক্ষে তাদের শান্তি, সচ্ছলতা, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, জমি-জমা ও বাগবাগিচার উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা, সজীবতা ও উৎকৃষ্ট মান তাদেরকে এতটাই গর্বিত করে তুলেছিলো যে, তারা ওই খারাপ ব্যাপারগুলোকে তাদের ব্যক্তিগত উত্তরাধিতকার এবং বংশগত কৌশল মনে করে বসেছিলো। এক মুহূর্তের জন্য তাদের অন্তরে এই ধারণার উদয় হতো না যে, এসবকিছুই, তাদের যাবতীয় প্রাচুর্যই আল্লাহ তাআলার

দান। এটা বুঝতে পারলে তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো এবং অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত থাকতো। মোটকথা, তাদের এই নিশ্চিন্ততা তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অসচ্চরিত্রতা এবং নানা ধরনের অসৎ প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো।

অবশেষে আল্লাহর গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র হয়ে উঠলো এবং আল্লাহ তাআলার রীতি অনুযায়ী তাদেরকে সত্যপথ প্রদর্শনের, পাপাচার ও অসৎ কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদেরকে আমানতদার, পরহেযগার ও চরিত্রবান বানানোর জন্য তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করেন এবং তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাত প্রদান করেন। এভাবে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌছানোর জন্য ইমাম নিযুক্ত করে দেন। ইনি হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম।

আল্লাহপাকের তাওহিদ ও একত্ব এবং শিরকের প্রতি অসন্তোষ ও বিরোধিতা তো নবীগণের শিক্ষা মৌলিক ভিত্তি ও প্রদান কেন্দ্রবিন্দু। হযরত শুআইব আ. তার অংশীদার হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কওমের বিশেষ বিশেষ অসৎ গুণাবলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের এবং তাদেরকে সৎপথে আনয়নের জন্য তিনি এই বিধানের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছিলেন যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সবসময় সৎ থাকতে হবে এবং এ-বিষয়ের প্রতি সবসময় লক্ষ রাখতে হবে যে, প্রত্যেকের প্রাপ্য হক যেনো প্রত্যেকে পূর্ণ মাত্রায় পায়। কেননা, পার্থিব কাজ-কারবারে এটা এমন একটি মৌলিক ভিত্তি, যা টলমলায়মান হয়ে পড়ার পর কাজ-কারবারগুলো সব ধরনের জুলুম পাপাচার, অসৎ কর্মকাণ্ড, মারাত্মক দোষসমূহ এবং মন্দ চারিত্রের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মোটকথা, হযরত শুআইব আ. তাঁর সম্প্রদায়ের অসৎ কর্মকাণ্ড দেখে অত্যন্ত দুঃখবোধ করলেন। তিনি তাদেরকে সৎপথ ও হেদায়েতের শিক্ষা প্রদান করলেন। তিনি তাঁর কওমকে সেসব মূলনীতির প্রতিই আহ্বান করলেন যা আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত ও নসিহতের মৌলিক বিষয় ও সরমর্ম।

তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন—

'হে আমার কওম, (মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে) এক আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত আর কোনো বস্তুই ইবাদতের যোগ্য নয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ওজন ও মাপ সঠিক রাখো এবং পুরোপুরি দাও। আর মানুষের সঙ্গে কাজে-কারবারে ছলচাতুরি করো না। গতকাল পর্যন্ত হয়তো তোমরা এসব মন্দ স্বভাব ও অসৎ চরিত্রের পরিণাম কী হবে তা জানতে পারো নি; কিন্তু আজ

তোমাদের নিকট আল্লাহ তাআলার প্রমাণ ও নিদর্শন এসে পৌঁছেছে। এখন অজ্ঞতা ও না-জানা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। সত্যকে গ্রহণ করো এবং বাতিল ও মিথ্যা থেকে বিরত হও। এটাই সফলকাম হওয়ার একমাত্র পথ। আর আল্লাহর জমিনে ফেৎনা-ফাসাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করো না। আল্লাহ তাআলা তাতে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আর দেখো, তোমরা কখনো এমন করো না যে, সত্য প্রচারের পথকে বন্ধ করার জন্য এবং মানুষকে লুণ্ঠন করার জন্য প্রতিটি পথের ওপর গিয়ে বসো। তোমরা এমনও করো না, যে-ব্যক্তিই ঈমান আনে, আল্লাহর পথ অবলম্বন করার কারণে তাকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকো এবং তাকে পুনরায় বিপথগামী করার পেছনে উঠে-পড়ে লেগে যাও। হে আমার কওমের লোকসকল, সেই সময়ের কথা স্মরণ করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া স্বীকার করো যে, তোমরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য ছিলে। এরপর আল্লাহ তাআলা শান্তি ও নিরাপত্তা দান করে তোমাদের সংখ্যাকে খুব অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

হে আমার কওম, এ-বিষয়টির প্রতিও একটু চিন্তা-ভাবনা করো, যারা আল্লাহর জমিনে ফেতনা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে তাদের পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ ও সবার জন্য শিক্ষামূলক। যদি তোমাদের মধ্য থেকে একদল আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অন্যদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে এখানেই বিষয়টির সমাপ্তি ঘটবে না। তোমরা ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে শেষ মীমাংসা করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম মীমাংসাকারী।'

হযরত শুআইব আ. বিশুদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ এবং মার্জিত ও স্থানোচিত ভাষণ প্রদান করতেন। তিনি মাধুর্যপূর্ণ বাণী, সুন্দর সম্ভাষণ, বর্ণনাশৈলী এবং বাকচাতুর্যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এ-কারণেই মুফাস্‌সিরগণ তাঁকে খাতিবুল আম্বিয়া উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন। তিনি কোমল ও কঠিন সব ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেই তাঁর কওমকে হেদায়েত ও নসিহতের এই কথাগুলো বললেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগা কওমের ওপর এসব কথার কোনো ক্রিয়াই হলো না। গুটিকয়েক দুর্বল লোক ছাড়া কেউই আল্লাহপাকের এই পয়গামের প্রতি কর্ণপাত করলো না। তারা নিজেরাও আগের মতোই পাপকাজে লিপ্ত থাকলো এবং অন্য লোকদের পথেও বাধা প্রদান করতে লাগলো। তারা পথে পথে বসে থাকতো এবং হযরত শুআইব আ.-এর কাছে

যাতায়াতকারীদের সত্যগ্রহণে বাধা দিতো। সুযোগ পেলে জনগণের সম্পদ লুঠপাট করতো। এতকিছু সত্ত্বেও যদি কোনো সৌভাগ্যবান সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতো এবং সত্যকে গ্রহণ করে নিতো, তবে তারা তাকে ভীতি প্রদর্শন করতো, হুমকি দিতো এবং নানাভাবে বিপথগামী করার চেষ্টা করতো। কিন্তু কওমের এসব বাধার মুখে হযরত শুআইব আ.-এর সত্যের আহ্বান সবসময় অব্যাহত থাকলো। তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা, যারা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদার জন্য গর্বিত ছিলো, শুআইব আ.-কে বললো, হে শুআইব, দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় অবশ্যই ঘটবে, হয়তো আমরা তোমাকে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী অনুসারীদেরকে অবশ্যই আমাদের বস্তি থেকে বের করে দেবো এবং তোমাদেরকে দেশান্তরিত করবো। অথবা তোমাদেরকে পুনরায় আমদের ধর্মের প্রতি ফিরে আসতে বাধ্য করবো।

হযরত শুআইব আ. বললেন, আমরা তোমাদের ধর্মকে মিথ্যা ও বাতিল বলে মনে করি, তারপরও যদি আমাদেরকে তা মেনে নিতে হয়, তাহলে তা হবে বড় জুলুমের বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তোমাদের বাতিল ধর্ম থেকে মুক্তি দিয়েছেন, এরপর যদি আমরা সেই ধর্মেরই দিকে পুনরায় ফিরে যাই, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, আমি মিথ্যা বলে আল্লাহর প্রতি অসত্যের অপবাদ আরোপ করলাম। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার যদি সেটাই ইচ্ছা হয়, তবে তিনি যা-ইচ্ছা তা-ই করবেন। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টনকারী এবং ব্যাপক। আমরা তো কেবল তাঁরই ওপর ভরসা রাখবো। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে সত্যের সঙ্গে মীমাংসা করে দিন। নিঃসন্দেহে আপনিই উত্তম মীমাংসাকারী।

কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যখন হযরত শুআইব আ.-এর মধ্যে এই দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্প দেখতে পেলো তখন তাদের কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেদের কওমকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো, সাবধান! যদি তোমরা শুআইবের কথা মান্য করো, তবে তোমরা ধ্বংস ও বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

হযরত শুআইব আ. এটাও বললেন, দেখো, আল্লাহ তাআলা আমাকে এইজন্য প্রেরণ করেছেন, যেনো আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করি। আর আমি যা-কিছু বলছি তার সত্যতার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রমাণ ও নিদর্শনও পেশ করছি। কিন্তু আফসোস, তোমরা এসব স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দেখেও অবাধ্যাচরণ ও নাফরমানির ওপরই অটল

রয়েছো। অবাধ্যাচরণ এবং বিরোধিতার এমন কোনো দিক নেই যা তোমরা ত্যাগ করেছো। আমি আমার নসিহত ও হেদায়েতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছি না এবং তোমাদের কাছে দুনিয়ার কোনো স্বার্থও চাচ্ছি না। আমার প্রতিদান তো আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে। এখনো যদি অবাধ্যাচরণ করতে থাকো, তবে আমার আশঙ্কা, আল্লাহ তাআলার আযাব এসে তোমাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ না করে ছাড়ে। আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত অটল। তাকে প্রতিরোধ বা খণ্ডন করার সাধ্য কারো নেই।

কওমের সরদাররা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললো, শুআইব, তোমার নামায কি আমাদের কাছে এটাই চায় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেবতার পূজা ত্যাগ করি এবং নিজেদের ধন-সম্পদে আমাদের এই স্বাধীনতা না থাকে যে, যেভাবে ইচ্ছা লেনদেন করি। যদি আমরা ওজনে কম দেয়া ছেড়ে দিই এবং মানুষের সঙ্গে কাজ-কারবারে তাদেরকে কম দিয়ে ক্ষতি না করি, তবে তো দরিদ্র ও কাঙাল হয়ে পড়বো। সুতরাং, এমন শিক্ষাপ্রদানে কেউ কি তোমাকে সত্যিকারের পথপ্রদর্শক বলে মানতে পারে?

হযরত শুআইব আ. অত্যন্ত মনোব্যথা এবং ভালোবাসার সঙ্গে বললেন, হে আমার কওম, আমার এই ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের এই বেপরোয়া ভাব এবং আল্লাহর নাফরমানি পাছে তোমাদের জন্য সেই পরিণামই টেনে না আনে, যে-পরিণাম হয়েছিলো তোমাদের পূর্বে নুহ আ., হুদ আ., সালেহ আ. ও লুত আ.-এর সম্প্রদায়গুলোর। এখনো সময় শেষ হয়ে যায় নি। আল্লাহ তাআলার সামনে মস্তক অবনত করো এবং তোমাদের অসৎ কার্যাবলির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। ভবিষ্যতে সবসময়ের জন্য ওইসব মন্দকাজ থেকে তওবা করো। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক অত্যন্ত, দয়ালু। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

কওমের সরদাররা এ-কথা শুনে জবাব দিলো, হে শুআইব, তুমি কী বলছো তা তো আমাদের কিছুতেই বুঝে আসছে না। তুমি আমাদের সবার চেয়ে দুর্বল ও দরিদ্র। তোমার কথাগুলো যদি সত্য হতো তাহলে তোমার জীবন আমাদের জীবনের চেয়ে উত্তম হতো। আমরা কেবল তোমার বংশকে ভয় করছি। অন্যথায় আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করে ছাড়তাম। তুমি আমাদের ওপর কখনো জয়ী হতে পারবে না।

হযরত শুআইব আ. বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমাদের জন্য কি আল্লাহর মোকাবিলায় আল্লাহর চেয়ে আমার বংশ তোমাদের জন্য অধিক

ভয়ের কারণ হচ্ছে? অথচ আমার প্রতিপালক তোমাদের যাবতীয় কার্যকে বেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সবকিছুই জানেন এবং সবকিছুই দেখছেন। আচ্ছা, যদি তোমরা আমার উপদেশ না মানো, তবে জেনে রাখো, তোমরা সেসব কাজই করতে থাকো যা করছো। অচিরেই আল্লাহর ফয়সালা বলে দেবে যে, আযাবের উপযোগী কারা আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা করতে থাকো এবং আমিও অপেক্ষা করতে থাকলাম।

অবশেষে তা-ই ঘটলো যা ছিলো আল্লাহর নীতিমালার চিরন্তন ফয়সালা ও মীমাংসা। অর্থাৎ দলিল-প্রমাণ আসারও পরও যখন বাতিলের ওপর হটকারিতা করা হয় এবং দলিল-প্রমাণের সত্যতা নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়, সত্যে প্রচারে ও অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তখন আল্লাহর আযাব এসে সেই অপরাধী জীবনগুলোর অবসান ঘটিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যতের লোকদের জন্য সেই ঘটনাকে শিক্ষাগ্রহণমূলক দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেয়।

আযাবের ধরন

পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, নাফরমানি এবং পাপাচারের পরিণামে হযরত শুআইব আ.-এর কওমের ওপর দুই প্রকারের আযাব এসে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে। একটি ভূমিকম্পের শাস্তি আর দ্বিতীয়টি আগুনের বৃষ্টি। যখন নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ ঘরে আরাম করছিলো, তখন অকস্মাৎ এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প শুরু হলো। এই ভয়ঙ্কর শাস্তি শেষ হতে না হতেই তাদের ওপর আগুন বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। ফল এই দাঁড়ালো যে, সকালে দর্শকেরা দেখতে পেলো, গতকালের অবাধ্য ও অহঙ্কারীরা আজ দগ্ধ ও উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (سورة الأعراف)

'অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো (ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করলো)। ফলে তাদের প্রভাত হলো নিজগৃহে অধমুখে পতিত অবস্থায়।' [সুরা আরাফ : আয়াত ৯১]

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (سورة الشعراء)

'এরপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো (শুআইব আ.-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো), পরে তাদেরকে গ্রাস করলো মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি (আগুন

বর্ষণকারী মেঘঅলা শাস্তি)। তা তো ছিলো এই ভীষণ দিবসের শাস্তি। [সূরা শুআরা: আয়াত ১৮৯]

পুরো ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ () وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ () بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ () قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ () قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ () وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ () وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ () قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ () قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ () وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ () وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ () كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (سورة هود)

'মাদয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুয়াইবকে (নবীরূপে) পাঠিয়েছিলাম। সে (তাদেরকে) বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্যকোনো ইলাহ নেই। মাপে ও ওজনে কম করো না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী (সচ্ছল ও অবস্থসম্পন্ন) দেখছি, (আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অনেককিছু দান করে রেখেছেন। সুতরাং নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করা নিজেদের রক্ষা করো।) কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি এবং সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি (যা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন ও বেষ্টিত করে ফেলবে)। হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মেপো ও ওজন করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু (তাদের প্রাপ্য হকের চেয়ে) কম দিয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে (তোমাদের কারবারে) আল্লাহ অনুমোদিত[৪৫] যা অবশিষ্ট থাকবে তোমাদের জন্য তা উত্তম। (আর দেখো, আমার কাজ তো শুধু নসিহত করা এবং তোমাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেয়া,) আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই (যে, বাধ্যতামূলকভাবে তোমাদেরকে আমার পথে চালিয়ে নেবো)। তারা বললো, 'হে শুআইব, তোমার সালাত (যা তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে পড়ছো) কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমার পিতৃপুরুষেরা যার ইবাদত করতো আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি (তা-ও বর্জন করতে হবে)? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, ভালো মানুষ।' (বাহ, তুমিই একজন কোমলহৃদয় ও ভালো মানুষ থেকে গেলে।) সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমারকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম (থেকে উত্তমতর) জীবনোপকরণ দান করে থাকেন তবে কী করে আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকবো? (আমি কি তোমাদেরকে সত্যপথ প্রদর্শন করবো না?) আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। (আমার এমন কোনো ইচ্ছা নেই যে, তোমাদেরকে যা থেকে বারণ করি, তাতে আমি নিজেই লিপ্ত হই।) আমি তো আমার সাধ্যমতো সংস্কারই করতে চাই। আমার কর্মসাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে; আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। হে আমার সম্প্রদায়, আমার সঙ্গে বিরোধ

---

[৪৫] ঠিকমত মাপ দেয়ার পর যা লাভ হবে সেটাই আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত।

যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই এমন অপরাধ না করায় যাতে তোমাদের ওপর তার অনুরূপ বিপদ আপতিত হয় যা আপতিত হয়েছিলো নুহের সম্প্রদায়ের ওপর অথবা হুদের সম্প্রদায়ের ওপর কিংবা সালেহের সম্প্রদায়ের ওপর; আর লুতের সম্প্রদায় (-এর বিষয়টি) তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে (নিজেদের পাপকাজের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো; আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু, প্রেমময়।' তারা বললো, 'হে শুআইব, তুমি যা বলো তার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার (সঙ্গে তোমার) আত্মীয়স্বজন না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম, আর তুমি আমাদের ওপর শক্তিশালী নও।' (আমাদের সামনে তোমার কোনো অস্তিত্বই নেই।) সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি আমার আত্মীয়স্বজন আল্লাহ থেকেও বেশি শক্তিশালী? (তোমাদের কাছে আল্লাহ তাআলা কিছুই নন যে,) তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলে রেখেছো। (তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছো।) তোমরা যা করো, আমার প্রতিপালক অবশ্যই তা পরিবেষ্টন করে আছেন। (তোমরা তাঁর জ্ঞানের সীমার বাইরে কখনো যেতে পারবে না।) হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শিগগিরই জানতে পারবে, কার ওপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' যখন আমার নির্দেশ এলো তখন আমি শুআইব এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম। যারা সীমালঙ্ঘন করেছিলো, এরপর মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো, ফলে (প্রত্যূষে দেখা গেলো) তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়ে আছে, যেনো তারা ওখানে কখনো বসবাস করে নি। জেনে রাখো, ধ্বংসই ছিলো মাদয়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিলো সামুদ সম্প্রদায়।' [সুরা হুদ : আয়াত: ৮৪-৯৫]

শুআইব আ.-এর কবর

হাযরামাউত নামক স্থানে একটি কবর আছে। এটি বিশিষ্ট ও সাধারণ সর্বস্তরের মুসলমানের যিয়ারতের স্থান হয়ে রয়েছে। ওখানকার অধিবাসীদের দাবি—ওটা হযরত শুআইব আ.-এর মাজার। মাদয়ানবাসীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত

হওয়ার পর শুআইব আ. ওখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। ওখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। হাযরামাউতের বিখ্যাত শহর 'শিউন'-এর পশ্চিম দিকে একটি জায়গা আছে যাকে 'শাবাম' বলা হয়। ওখানে যদি কোনো ভ্রমণকারী 'ওয়াদিয়ে ইবনে আলি'র পথ ধরে উত্তর দিকে চলতে থাকে, তবে ওই ওয়াদি বা উপত্যকার পর সেই স্থানটি আসে, যেখানে শুআইব আ.-এর মাজার অবস্থিত। এখানে আদৌ কোনো বসতি নেই। যারাই এখানে আসেন, কেবল মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই এসে থাকেন।

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার বলেন, এই কবরটির ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে যে, তা হযরত শুআইব আ.-এর কবর কি-না। কিন্তু তিনি এই সন্দেহের কোনো কারণ বর্ণনা করেন নি।

জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও উপদেশ

অতীতকালের কওম ও সম্প্রদায়সমূহের এসব ঘটনা নিছক কিচ্ছা-কাহিনি নয়; সেগুলো বরং শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত। চক্ষুষ্মানদের জন্য হাজারো উপদেশ গ্রহণের মূলধন। যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করা না-ও হয়, তারপরও আমার উপরিউক্ত ঘটনাবলি থেকে নিম্নলিখিত ফলগুলো লাভ করতে পারি।

১. সুরা আ'রাফে বলা হয়েছে, হযরত শুআইব আ. তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন—

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

'তোমাদের কাছে তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলিল-প্রমাণ এসে গেছে।' [সুরা আরাফ : আয়াত ৮৫]

কিন্তু পবিত্র কুরআনে অন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর মতো হযরত শুআইব আ.-এর কোনো মুজেযার, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিদর্শনের উল্লেখ করা হয় নি। উলামায়ে কেরাম এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : একটি হলো, নবী ও রাসুল যদি কোনো প্রকারের মুজেযা বা অলৌকিক কাণ্ড নাও নিয়ে আসেন, আল্লাহ তাআলার পয়গামের জন্য কেবল স্পষ্ট দলিল-প্রমাণই পেশ করেন, তবে এই উজ্জ্বল ও স্পষ্ট প্রমাণই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ মুজেযা। দ্বিতীয় নিদ্ধান্ত হলো, এখানে 'দলিল-প্রমাণের' বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহপাকের প্রতি সোপর্দ করা উচিত। কেননা, হয়তো হযরত শুআইব আ.-কেও আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য নবীগণের মতো শরিয়তের দীপ্তিমান

প্রমাণাদি ব্যতীত মুজেযাস্বরূপ কোনো নিদর্শন (আয়াতুল্লাহ) প্রদান করা হয়েছিলো। পবিত্র কুরআন যদিও তা এখানে বর্ণনা করে নি, কিন্তু শুআইব আ. তাঁর

إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলিল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি...'[৪৬] কথায় সেই নিদর্শনের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

২. আমাদের অসংখ্য ভুলের মধ্যে এটাও একটা মারাত্মক ভুল দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মধ্যে রয়েছে যে, আমরা কুরানুল কারিমের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকার কারণে মনে করে বসে আছি যে, ইসলামি জীবনের স্তম্ভগুলোর মধ্যে কেবল ইবাদতই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ধর্মে কাজ-কারবার, লেনদেন ইত্যাদি মুআমালার মধ্যে আচরণ ঠিক রাখা, ন্যায্যতা বজায় রাখা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কোনো গুরুত্ব নেই। এ-কারণে বর্তমান যুগের ফাসেক লোকদের কথা তো বলাই বাহুল্য, অনেক পরহেযগার ব্যক্তির মধ্যেও বান্দার হক এবং কাজ-কারবার ও লেনদেন সম্পর্কে বেপরোয়া ভাব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বান্দার হকসমূহের সংরক্ষণ, পারস্পরিক সামাজিক লেনদেন এবং কাজ-কারবারের মধ্যে দীনদারি ও আমানতদারিকে ইসলাম ধর্মে কোন্ স্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণ্য করা হয়েছে তা এই ব্যাপারটি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা একজন উচ্চস্তরের নবীকে নবীরূপে পাঠানোর উদ্দেশ্য কেবল এই 'বান্দার হক সংরক্ষণই' সাব্যস্ত করেছেন।

৩. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অন্যের প্রাপ্য হককে ঠিকমতো বুঝিয়ে না দেয়া মানবজীবনে এমন এক ব্যাধি সৃষ্টি করে দেয় যে, এই অসৎ স্বভাব ব্যাপক হতে হতে একসময় বান্দার যাবতীয় হককে বিনষ্ট করার স্বভাব জন্ম দেয়। এইভাবে মানবজাতির মর্যাদা এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা এবং হীনতা ও নীচতার মতো নিকৃষ্ট স্বভাবসমূহের ধারক-বাহক বানিয়ে দেয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

[৪৬] সুরা হুদ : আয়াত ২৮।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ () الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ () وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (سورة المطففين)

'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের কাছ মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, এবং যখন তাদের জন্য মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।' [সূরা মুতাফ্ফিফিন : আয়াত ১-৩]

এভাবে আল্লাহপাক أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ 'তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মেপো ও ওজন করো।'[৪৭] বলে এই সত্যকে বর্ণনা করে দিলেন যে, মাপে ও ওজনে ন্যায়নীতি অবলম্বন করা শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের যাবতীয় কাযকলাপে এই পূর্ণতা থাকা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর বান্দাগণের যাবতীয় হক ও তাদের প্রতি কর্তব্য পালনে এই একটি নীতিকে মূল ভিত্তি বানিয়ে নেয়। কোনো ক্ষেত্রে এবং কোনো অবস্থাতেই যেনো ন্যায় ও ইনসাফের পাল্লাকে হাতছাড়া না করে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মাপে ও ওজনে কম না করা এবং ইনসাফকে ঠিক রাখা যেনো একই মাপকাঠি। যে-ব্যক্তি মানবজীবনে সাধারণ লেনদেনের ব্যাপারে ইনসাফ ঠিক রাখে না তার থেকে কী আশা করা যেতে পারে? সে কি ধর্মীয় ও পার্থিব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে কাজে লাগাবে?

৪. অবস্থার সংশোধনের পর আল্লাহর জমিনে ফাসাদ বিস্তার করার চেয়ে বড় কোনো অপরাধ নেই। কেননা, জুলুম, হত্যা, সতীত্ববিনাশ-তুল্য বড় বড় অপরাধগুলোর ভিত্তি ও মূল হলো এই হীন স্বভাব।

৫. বাতিলের একটি বড় পরিচয় এই যে, না তার নিজের পক্ষে কোনো স্পষ্ট বা উজ্জ্বল প্রমাণ আছে, না তা কোনো স্পষ্ট প্রমাণকে বরদাশত করতে পারে। বাতিলের সামনে যখন দলিল-প্রমাণের আলো এসে উপস্থিত হয়, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং চোখ বন্ধ করে ফেলে। আর ওই আলোর উপস্থিতি সহ্য করতে না পেরে দলিল ও প্রমাণের জবাব ক্রোধ, হুমকি-ধমকি ও হত্যার মাধ্যমে প্রদান করতে প্রস্তুত হয়ে পড়ে।

আপনারা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের সঙ্গে সত্যের অনুসারীগণের জীবনের সঙ্গে তাঁদের বিপক্ষ ও বিরোধী বাতিল পূজারীদের জীবন তুলনা করে দেখুন এবং ইতিহাসের পাতা থেকে পরিষ্কার সাক্ষ্য গ্রহণ

---

[৪৭] সূরা হুদ : আয়াত ৮৬।

করুন। তাহলে আপনাদের কাছে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট ও দীপ্তিমান হয়ে উঠবে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করছেন, আল্লাহপাকের কুদরতের নিদর্শন মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করছেন। তাঁরা ভালোবাসা ও দয়ার আবেগ প্রকাশ করছেন। তাঁদের দাওয়াত ও তাবলিগের বিনিময়ে জনাসাধারণের ও পর আর্থিক চাপ প্রয়োগ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন। কিন্তু এসব ব্যাপার সত্ত্বেও অপর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে বলা হচ্ছে, আমরা তোমাকে দেশান্তরিত করে ছাড়বো, আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো। আমরা তোমাকে খুন করে ফেলবো। আর যদি আল্লাহর নবী শেষবারের মতো এ-কথা বলেন যে, যদি তোমরা আমার ডাকে সাড়া না দাও, তবে অন্তত আমাদের অস্তিত্বকে সহ্য করো এবং এতটুকু ধৈর্য ধারণ করো যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা নিজেই করে দেবেন। তখন এর জবাবেও অপর পক্ষ থেকে অস্বীকার, বিদ্রূপ করা হয় এবং এই দাবি করা হয় যে, বেশ, এখন তোমার হেদায়েত ও নসিহত বন্ধ করো। আর যদি তুমি সত্য হও তাহলে আমাদেরকে যে-শাস্তির ভয় দেখাচ্ছো তা এখনই নিয়ে আসো। অন্যথায় আমরা চিরকালের জন্য তোমার ও তোমার মিশনের অবসান ঘটিয়ে দেবো।

৬. সত্য ও মিথ্যা এবং হক ও বাতিলের এটাই সর্বশেষ ধাপ, যার পরে অবাধ্য ও অহঙ্কারী সম্প্রদায়গুলোর জন্য আল্লাহর বিধান, যাকে কর্মফলের বিধান বলা হয়, দুনিয়াতেই চালু হয়ে যায়। তাদেরকে ধ্বংস করে ভবিষ্যতের বংশধর ও সম্প্রদায়গুলোর জন্য উপদেশ ও নসিহত গ্রহণের উপকরণ প্রস্তুত করে দেয়।